জুলভার্ন

চাঁদে অভিযান

শামসুদ্দিন নওয়াব

চাঁদে অভিযান

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮৪

এক

আমেরিকানরা বরাবরই একটু হুজুগে। কারও মাথায় উদ্ভট কোন আইডিয়া উঁকি দিলেই হল; অমনি দু'দশজন জড় করে একটা ক্লাব গড়ে তোলা চাই। বাল্টিমোর শহরের গান ক্লাবও গড়ে উঠেছিল এরকম কয়েকজন হুজুগে লোকের প্রচেষ্টায়। ইচ্ছে করলেই এ ক্লাবের সদস্য হওয়া যায় না। শুধুমাত্র তারাই সদস্য হতে পারে যাদের বড় বড় কামানের নকশা আঁকার কৃতিত্ব আছে। এ ব্যাপারে কড়াকড়ি থাকলেও প্রথম মাসেই সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল এক হাজার আটশো তেত্রিশে, এ ছাড়া হাফ-সদস্যের সংখ্যাও ত্রিশ হাজার ছাড়িয়ে গেল।

ক্লাবের সভ্যদের কাজ একটাই–নিত্যনতুন মডেলের কামান, বন্দুক, রাইফেল আর সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কার্তুজ, বুলেট ও গোলা তৈরি করা। এসব তৈরি করতে গিয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে যেত–আর সেজন্যই গান ক্লাবের সভ্যদের কেউই শারীরিক দিক দিয়ে নিখুঁত নয়। কারও হাত আছে কিন্তু পা লাপাত্তা, কারও পা আছে কিন্তু দুটো হাতই উধাও; আবার কারও কারও চোখ, নাক কিংবা কান এমন কি চোয়াল পর্যন্ত হাওয়া হয়ে গেছে। তাতেও এদের উৎসাহের কমতি নেই, নকল হাত, কাঠের পা, ক্রাচ, রবারের চোয়াল, পাথরের চোখ, এসব দিয়ে দিব্যি কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। আসলে মনোবল এদের এতই মজবুত যে 'অসম্ভব' বলে কোন শব্দও কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়।

ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কয়েক বছর সদস্যদের হাতে কাজের কোন কমতি ছিল না; কারণ সে-সময় গোটা আমেরিকা জুড়েই চলছিল জোর লড়াই। আর লড়াই মানেই তো কামান বন্দুক আর গোলাবারুদের পেছনে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করা। কাজেই ওই সময়ে গান ক্লাবের একেকজন সদস্যর পকেট যে রীতিমত ফুলে ফেঁপে উঠছিল তা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সময় কখনও একরকম যায় না। আমেরিকার গৃহযুদ্ধও একদিন শেষ হয়ে এল। সেই সঙ্গে কামান বন্দুক আর গোলাবারুদের প্রয়োজনও ফুরাল। ক্লাবের সদস্যদের জন্য কেউই আর নতুন কোন ফরমাইশ নিয়ে হাজির হয় না। ভাগ্যের পরিহাস আর কাকে বলে–আগে যাদের পকেট ডলার দিয়ে ঠাসা থাকত তারাই আবার রাতারাতি বেকারে পরিণত হল। বলা নেই কওয়া নেই একেবারে হুট করেই যেন আমেরিকার পুরো আদলটা পাল্টে গেল। কিছুদিন আগেও যেখানে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যেত না, আজ সেখানেই আবার 'শান্তি চাই' রব উঠেছে। দেশের রাজনীতি যে এমনিভাবে পাল্টে যাবে তা কারুরই জানা ছিল না। তাই যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে গান ক্লাবের সবাই মনে মনে প্রমাদ গুণল এবার। নতুন কাজ কর্ম

একেবারেই নেই: তার উপর মাসের পর মাস হাত গুটিয়ে বসে থাকতে থাকতে কুঁড়ের রাজা বনে গেল একেকজন।

ক্লাবের সুনাম শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা গেল না–সদস্যদের হাতে কোন কাজই নেই তো সুনাম হবে কোত্থেকে! অথচ এমন একদিন ছিল যখন বিদেশ থেকেও লোকেরা এসে অন্তত একটিবার গান ক্লাবে ঢুঁ মেরে নিজেকে ধন্য মনে করত। আর আজ? দু'চারজন উদ্যোক্তা ছাড়া কেউই ক্লাবের ছায়াও মাড়ায় না। ক্লাবের রুমগুলো আগে সদস্যদের হৈ-চৈ আর চিৎকারে গম গম করত–আর আজ সেখানে বেয়ারা বাবুর্চিরা বসে বসে ঝিমোয়। বড় হলরুমটা–যেখানে প্রতি সপ্তাহেই মীটিং বসত, এখন সেখানে চামচিকা আর তেলাপোকাদের মীটিং বসে!

তেসরা অক্টোবর সন্ধ্যার দিকে কয়েকজন জড় হয়েছিল গান ক্লাবের সেই বড় হলরুমটায়। টম হান্টার ক্লাবের সেক্রেটারি। ম্যাস্টন, বিল্‌স্‌বি আর কর্নেল ব্লুম্‌স্‌বি; এরা সবাই ক্লাবের পুরানো সভ্য। ফায়ার প্লেসের গনগনে উত্তাপে স্মৃতি রোমন্থন বেশ ভালই জমে উঠেছিল।

গলাটা একটু কেশে নিয়ে হান্টার বলল, 'এভাবে কাঁহাতক আর বসে থাকা যায়; আর কিছুদিন এভাবে চললে হয়ত পাগলই হয়ে যাব। অথচ এমন একদিন ছিল যখন কামানের গর্জনে আমাদের ভোর হত, আর রাতেও ওই আওয়াজটা শুনতে না পেলে দু'চোখ বুজত না। সেসব দিন আর কি ফিরে আসবে?'

'মাথা খারাপ! শুনছ না চারদিকে কেমন "শান্তি চাই, শান্তি চাই" রব উঠেছে? নতুন করে যুদ্ধের চিন্তা-ভাবনা মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় কর, নইলে কিন্তু দেশদ্রোহীর খাতায় নাম উঠে যাবে,' বিল্‌স্‌বি বলল।

ম্যাস্টন এতক্ষণ চুপ করে এদের কথা শুনে যাচ্ছিল; এবার মুখ খুলল সে. 'সবই কপালের লিখন। তা না হলে হঠাৎ যুদ্ধই বা থেমে যাবে কেন আর আমরাই বা হাত গুটিয়ে বসে থাকব কেন? যুদ্ধটা আর ক'টা দিন চললেই দেখতে পেতে; আমার নতুন মডেলের কামান। সে একখানা জিনিস বটে! যুদ্ধের পুরো চেহারাটাই পাল্টে দেয়া যেত।'

'সত্যি?' কর্নেল ব্লুম্‌স্‌বির কণ্ঠে কিছুটা অবিশ্বাসের সুর।

'অবশ্যই; তুমি নিজেই একবার নকশাটা পরীক্ষা করে দেখ–তবেই বুঝবে আমার কথা ঠিক কি না।' বলে ম্যাস্টন পকেট থেকে নকশাটা বের করে কর্নেলের সামনে মেলে ধরল।

'সত্যিই ম্যাস্টন, কামান তৈরির ব্যাপারে তুমি একটা জিনিয়াস। এটা বাজারে একবার ছাড়তে পারলেই হয়! সমস্ত আমেরিকা জুড়েই নতুন করে আর একটা তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে।' ম্যাস্টনের নকশাটায় কয়েকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল কর্নেল। তার কণ্ঠস্বরে আগের সেই অবিশ্বাসের সুর তো নেই-ই বরং থেকে থেকে প্রশংসা উপচে পড়ছে, 'কিন্তু কথা হচ্ছে, এ মুহূর্তে এর কোন খদ্দের এদেশে পাওয়া যাবে না। তারচেয়ে বরং ইউরোপেই যাওয়া যাক। ব্যাটাদের ঠিকমত একবার উশকে দিতে পারলেই ব্যস, কেল্লা ফতে–দেখবে মহাদেশটা জুড়েই রক্তারক্তি বেধে গেছে।'

'তাতে আমাদের লাভ?' হান্টার জিজ্ঞেস করল।

'লাভ নয়ত কি? ওদের হয়ে কামান বানাব। যুদ্ধ করবে ওরা; মরবেও ওরা–কিন্তু পকেট ভারি হবে আমাদের! এতে লাভ ছাড়া লোকসানটা কোথায় শুনি?' বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিল কর্নেল।

বিল্‌স্‌বি এবারে মুখ খুলল, 'আমেরিকান হয়ে শেষে কি-না বিদেশীদের জন্যে কামান বানাব! কক্ষণও না। মান-সম্মান বলেও তো একটা কথা আছে।'

'অমন মান-সম্মানের নিকুচি করি। এদিকে বসে থাকতে থাকতে একেকজন কুঁড়ের বাদশা বনে গেলাম সে-খেয়াল আছে?'

'সেও বরং ভাল। তবুও আমেরিকানদের অন্যের মাইনে করা চাকর হওয়া সাজে না।' বিল্‌স্‌বির কথায় হান্টার সায় দিয়ে উঠল।

'বিল্‌স্‌বি আর হান্টার ঠিকই বলেছে। এছাড়া ওরা যা মিনমিনে! রক্তেই নেই তেজ তো যুদ্ধ করবে কি? যাই বল, কর্নেল, আমাদের সঙ্গে কিছুতেই ওদের বনবে না।' ম্যাস্টনের কথায় সবাই গম্ভীর হয়ে গেল।

'হুঁ। তাহলে দেখছি খেতখামার নিয়েই লেগে পড়তে হয়। তামাক চাষটা অবশ্য মন্দ নয়, সঙ্গে তিমি শিকারটা চালিয়ে যেতে পারলে তো ভালই হয়; আজকাল চর্বির যা দাম! বেশ দু'পয়সা বাড়তি আসবে। যুদ্ধ-টুদ্ধর চেয়ে এই-ই ঢের ভাল।' কথাটা হান্টার হাসিমুখে বললেও সবার কাছে তা কান্নার মত শোনাল।

'তুমি মিছেই নিরাশ হচ্ছ, হান্টার। যদি ভেবে থাক যে চিরকালই এরকম "শান্তি" "শান্তি" করে কাটবে, তাহলে কিন্তু দারুণ ভুল করবে। আরে বাপু, ফ্রান্স কি আমাদের দু'একটা জাহাজ ডুবিয়ে দিচ্ছে না? আর ইংল্যান্ডই বা কম যায় কিসে? ওরাও তো আমাদের লোকজনকে ফাঁসিতে লটকাচ্ছে। আর মাত্র কয়েকটা দিন সবুর কর। যুদ্ধ এই বাধল বলে! এখন শুধুমাত্র একটা অছিলা পেলেই হল।' ম্যাস্টনের কথা শুনে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

'অছিলা-টছিলায় কাজ নেই; ও অনেক সময়ের ব্যাপার। তারচেয়ে চল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই কিছু একটা করে বসি।' ব্লুম্‌স্‌বির কণ্ঠে মিলিটারি মেজাজ।

'বললেই হল! বিনা কারণে যুদ্ধ বাধাবার ফলাফলটা একবার ভেবে দেখেছ? সমস্ত পৃথিবীটাই আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে–এ আমি আগেই বলে রাখলাম।'

'সবকিছুতেই কারণ খুঁজতে যেয়ো না, বিল্‌স্‌বি। আচ্ছা, আমাদের দেশটাও তো একদিন ওদের দখলে ছিল, কিন্তু কেন?'

'তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?'

'মানে খুবই সহজ। আমাদের দেশটা যদি ওদের দখলে থাকতে পারে তো ওদের দেশটাও আমাদের দখলে এলে মন্দ কি?'

'একটু আস্তে কথা বল, কর্নেল। প্রেসিডেন্টের চরেরা চারদিকে ঘুরঘুর করছে। কথাটা তাঁর কানে একবার গেলে হয়; শ্রীঘরবাসী হয়েই শেষে দিন কাটাতে হবে।'

'গুলি মার তোমার প্রেসিডেন্টের। অমন গোমড়ামুখো প্রেসিডেন্টকে আগামীতে ভোট দিচ্ছে কে? অন্তত আমি নই।'

'আমরাও না।' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল হান্টার, বিল্‌স্‌বি আর ম্যাস্টন।

আলাপ আলোচনা আর কতক্ষণ চলত কে জানে! এমন সময় ক্লাবের বেয়ারা একটা সীলমোহর করা খাম হাতে নিয়ে রুমে ঢুকল। খাম খুলতেই দেখা গেল

ভেতরে একটা নোটিস; আর তা পাঠিয়েছেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মি. ইম্পে বার্বিকেন। একজন ডায়াসে উঠে নোটিসটা পড়ে শোনাল:

'গান ক্লাবের সমস্ত সদস্যকে জানানো যাচ্ছে যে, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মি. ইম্পে বার্বিকেন আগামী পাঁচই অক্টোবর রাত আটটায় এক আশ্চর্য খবর শোনাবেন। আরও জানানো যাচ্ছে যে, সভার বিষয়বস্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ; সুতরাং কেউই যেন–যত জরুরী কাজই থাকুক না কেন–সভায় অনুপস্থিত না থাকেন।'

দুই

৫ অক্টোবর। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতে তখনও কিছুটা দেরি। এরই মধ্যে গান ক্লাবের মস্তবড় হলরুমটা সদস্যদের ভিড়ে ভরে উঠেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে সদস্যরা কেবল আসছেই। কেউ গাড়িতে, কেউ ট্রেনে, আবার কেউ পায়ে হেঁটে। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লাবের বাকি রুমগুলোও লোকজনে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। সদস্য ছাড়া অন্য কেউ যাতে ঢুকতে না পারে সেজন্যে গেটে একজন দারোয়ান বসিয়ে দেয়া হল। অনেকেই ছল-চাতুরি করে ঢোকার চেষ্টা করল, কেউ কেউ আবার নগদ দক্ষিণাও দিতে চাইল–কিন্তু বেরসিক দারোয়ান কাউকেই পাত্তা দিল না। শেষমেষ রাস্তার মোড়ে এবং খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল হাজার হাজার উৎসাহী লোক।

হলরুমের এক কোনায় উজ্জ্বল আলোর নিচে সভাপতির আসন–আসনটি একটা কামান-টানা গাড়ির ওপর বসানো। পাশে বড় একটা টেবিল, টেবিলের সামনে সদস্যদের বসার জন্যে তৈরি করা হয়েছে বড় একটা গ্যালারি। রুমের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে অসংখ্য পিস্তল, রিভলভার, বন্দুক, রাইফেল, কামানের মডেল আর গুলিগোলার খাপ এবং খোল–উজ্জ্বল আলোয় ওগুলো রীতিমত ঝক্‌ঝক্ করছে।

এ অধিবেশনের সভাপতি মি. ইম্পে বার্বিকেন। ধীরস্থির স্বভাবের লোক। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে তাঁর কাজ। নিত্য নতুন কামান আর গোলাবারুদ তৈরির ব্যাপারে ম্যাস্টনও তাঁর কাছে শিশু। অথচ ক্লাবের হাজার হাজার সভ্যের মধ্যে তিনিই একমাত্র নিখুঁত শরীর নিয়ে টিকে আছেন। অসম্ভব বলে তাঁর কাছে কিছু নেই। সমস্যা যত কঠিনই হোক না কেন, একটা উপায় তিনি ঠিকই বের করে ছাড়বেন। আর সেজন্যেই ক্লাবের প্রতিটি সভ্যের কাছে তিনি এত প্রিয়।

আটটা বাজতে মিনিট দেড়েক বাকি থাকতেই ধীরেসুস্থে মঞ্চে উঠে নিজের আসনে বসে পড়লেন বার্বিকেন; মাথায় তাঁর কালো একটা রেশমী টুপি শোভা পাচ্ছে। আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

হলরুমের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন বার্বিকেন–চোখে মুখে একটা খুশি খুশি ভাব। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল, 'সংগ্রামী বীর ভায়েরা, প্রথমেই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিন। অনেক কষ্ট করে, অনেক জরুরী কাজ ফেলে আজ যাঁরা এ সভায় হাজির হয়েছেন তাঁদের সবাইকে

আবার জানাই মোবারকবাদ।

'আজ–বলতে দ্বিধা নেই–গান ক্লাবের সমস্ত সভ্য এক চরম দুর্দিনের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। যুদ্ধটা হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল। কর্মীর হাতগুলো বেকারের হাতে পরিণত হল। এতে কারুরই কিছু করার ছিল না–দৈবের ওপর কারও হাত নেই। ক্লাবের সুনাম আজ এমন এক নড়বড়ে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যা সত্যিই দুঃখজনক। এতে কেবলমাত্র সদস্যদের মাথা হেঁট হচ্ছে তা-ই নয়; বরং জাতি হিসাবে আমেরিকানদের আগের গৌরবও দিন দিন লোপ পাচ্ছে। সুতরাং আমাদের এমন কিছু করা দরকার যাতে দেশ ও জাতির সম্মান এবং ক্লাবের সুনাম দুই-ই রক্ষা পায়।

'আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, যুদ্ধ যদি আর না-ই হয় তাহলে কি আমরা হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ বসেই থাকব? আর বসে থেকে এই-ই কি প্রমাণ করব যে আমরা এ শতাব্দীর একদল অযোগ্য লোক? আপনারাই বলুন, এ মুহূর্তে আমাদের কি কিছুই করার নেই যাতে ক্লাব তার আগের সুনাম ফিরে পেতে পারে?'

হাজারটা গলা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'অবশ্যই আছে। আমরা নতুন কিছু করতে চাই।'

দু'হাত তুলে সবাইকে থামতে বললেন বার্বিকেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমাদের এমন কোন কাজে হাত দেয়া উচিত যা শুনে গোটা পৃথিবীটাই চমকে উঠবে। এমন কোন কাজ যা করা শুধু গান ক্লাবের সদস্যদেরই সাজে।'

'বলুন, মি. প্রেসিডেন্ট, সে-কাজটা কি?' আবারও একসঙ্গে হাজারটা কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল।

'চাঁদ সম্বন্ধে আপনাদের সবারই কমবেশি ধারণা আছে–চাঁদই হবে আমাদের লক্ষ্যবস্তু! আমেরিকার মোট রাজ্য সংখ্যা এখন ছত্রিশটি; গান ক্লাব চাইলে, এই চাঁদকেও আমেরিকার কব্জায় আনা সম্ভব। কাজটা যদিও খুবই কঠিন তবুও আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব–অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা শুধুমাত্র আমাদেরই সাজে।'

হাজার হাজার সদস্যের চিৎকারে হলরুমের ছাদ ভেঙে পড়ে আর কি!

'আপনারা জানেন,' বার্বিকেন আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'চাঁদ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রচুর কল্প-কাহিনী লেখা হয়ে গেছে। আমি সংক্ষেপে সেগুলো নিয়ে দু'চার কথা বলতে চাই। ১৬৪৯ সালে ডোমিঙ্গো গোঞ্জালেসের "চাঁদে অভিযান" নামে একটা বই বেরোয় যার লেখক ছিলেন ফ্রান্সের জাঁ বোরদোই। প্রায় একই সময়ে "জার্নিজ ইন দ্য মুন" নামে সিরানো ডি বারজাকের লেখা আরেকটি বই বাজারে বেরোয়–ওই একটিমাত্র বই লিখে বারজাক রাতারাতি খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে যান।

"নিউ ইয়র্ক আমেরিকান" পত্রিকা একবার একটা প্রবন্ধ ছেপেছিল। স্যার জন হার্সেল নাকি উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে একটা শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে চাঁদকে দেখেছিলেন। মাত্র কয়েক গজের মধ্যে এসে গিয়েছিল চাঁদটা। তিনি নাকি দেখেছেন চাঁদের বুকে হিপোপটেমাসের দল চরে বেড়াচ্ছে, বড় বড় দাঁতওয়ালা ভেড়ার পাল সবুজ পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘাস খাচ্ছে, বাদুড়ের মত ডানাওয়ালা এক ধরনের প্রাণীই নাকি সে রাজ্যের হর্তাকর্তা। আরও শুনবেন? হাইড্রোজেন গ্যাসের

চাইতে সাঁইত্রিশ গুণ হালকা গ্যাস ভরে একটা বেলুন ছাড়া হয়েছিল–মাত্র উনিশ ঘণ্টায় সে-বেলুন চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ল। এ উদ্ভট কাহিনীটি লিখেছিলেন সাহিত্যের একজন দিকপাল–যাঁর নাম এডগার এলান পো।

'এ তো গেল কল্প-কাহিনীর কথা। বিজ্ঞানও কিন্তু একেবারে বসে নেই। কিছুদিন আগে কয়েকজন জার্মান বিজ্ঞানী সাইবেরিয়ার বিশাল বরফ প্রান্তরে বড় বড় জ্যামিতিক নকশা আঁকার প্রস্তাব করেছিলেন; নকশাগুলো এমনভাবে আঁকা চাই যাতে আলো প্রতিফলিত হয়ে ওইগুলো জ্বলজ্বলে দেখায়। চাঁদে যদি বুদ্ধিমান জীব থেকেই থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তারা ওই নকশার মানে বুঝতে পারবে এবং চাঁদের বুকে নকশা এঁকে আমাদের সঙ্কেতের পাল্টা জবাব দেবে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাবটি কাগজে কলমেই রয়ে গিয়েছিল।

'আপনারা জানেন, গত কয়েক বছরে কামান এবং গোলাবারুদের কি দারুণ উন্নতি হয়েছে! এ ব্যাপারে গান ক্লাবের অবদান সবচাইতে বেশি। আমাদের তুখোড় বিশেষজ্ঞরা গোলাবারুদের কার্যকারিতা ও কামানের পাল্লাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন যা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদেরকে দুঃসাহসী করে তোলে–তাই বলছিলাম, একটা গোলা যদি চাঁদের বুকে ফেলা যায় তো মন্দ হয় না। এতে আমাদের কামান ও গোলাবারুদের ক্ষমতাটা আর একবার ঝালাই করে নেয়া যাবে; সেই সঙ্গে চাঁদের দেশটাও আমাদের অধিকারে আসবে।'

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথাই বলতে পারল না–বার্বিকেনের কথা শুনে সবাই যেন বোবা বনে গেছে!

বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই আনন্দে নেচে উঠল সবাই। তাদের কান ফাটানো চিৎকারে মনে হল, হলরুমটাই যেন আস্ত একটা কামানের গোলা!

হৈ-চৈ কিছুটা কমে এলে বার্বিকেন বললেন, 'আমি হিসেব করে দেখেছি, চাঁদ লক্ষ্য করে ছোঁড়া একটা গোলা সেকেন্ডে যদি বারো হাজার গজ পাড়ি দিতে পারে তাহলে তা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে ফাঁকি দিয়ে সহজেই চাঁদে পৌঁছতে পারবে। আপনাদের কাছে আমার আবেদন একটাই–ব্যাপারটাকে আজগুবি বলে উড়িয়ে না দিয়ে সবাই ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভেবে দেখুন। গান ক্লাবের সুনাম টিকিয়ে রাখতে হলে এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।'

তিন

গান ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মি. ইম্পে বার্বিকেনের বোধহয় আরও কিছু বলার ছিল। কিন্তু হৈ-হট্টগোল আর সদস্যদের উল্লাস কেবল বেড়েই চলল। কয়েকবার হাত তুলে তিনি তাদের শান্ত হতে অনুরোধ করলেন; কিন্তু কার কথা কে শোনে! শেষমেষ তিনি তাঁর আসনে বসে পড়লেন। তখন ঘটল আরেক বিপত্তি। ভক্তের দল তাঁকে চেয়ারসুদ্ধ মাথায় তুলে নিল; তারপর শ্লোগান দিতে দিতে বড় রাস্তায় নেমে পড়ল।

বার্বিকেনের বক্তৃতার পরপরই বাল্টিমোর শহরে উৎসবের বন্যা বয়ে গেল।

সারারাত ধরে চলল মিছিল, নাচগান আর মদের ছড়াছড়ি। আমেরিকার অন্যান্য শহরগুলোও কম গেল না–টেলিগ্রামে খবর পৌঁছতেই সেসব শহরেও সমান তালে ছুটল উৎসবের ফোয়ারা।

রাস্তাঘাটে, বারে কিংবা রেস্টুরেন্টে–দু'চারজন একসঙ্গে হলেই ব্যস; অমনি চাঁদ নিয়ে জোর তর্কে নেমে পড়া চাই। অফিস আদালত কিংবা স্কুল কলেজেও সেই একই ব্যাপার। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে চাঁদ নিয়ে দু'চার কথা বলতে না পারলে সমাজে মেলামেশাই দায় হয়ে উঠল। ফন্দিবাজ লোকেরা এ সুযোগে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিতে ছাড়ল না, এক চশমা ব্যবসায়ী চাঁদ দেখার জন্যে রঙিন চশমা বাজারে ছেড়ে রাতারাতি লক্ষপতি বনে গেল। কাগজঅলারাই বা কম যায় কিসে! নিত্য নতুন মুখরোচক খবরের টোপ ফেলতেই তাদের গ্রাহক সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলল।

আমেরিকার এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত যখন এই এক অবস্থা চলছিল, ইম্পে বার্বিকেনের মাথায় তখন ঘুরপাক খাচ্ছে অন্য চিন্তা। কল্পনায় চাঁদকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলা খুবই সহজ। কিন্তু কাজটা আসলেই যে বেজায় কঠিন তা তিনি গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিলেন; তাই সময় নষ্ট না করে ঝটপট কাজে নেমে পড়লেন।

চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র–এসব ব্যাপারে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ওস্তাদ। বার্বিকেন প্রথমেই এঁদের সাহায্য নিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত কেমব্রিজ মানমন্দিরের ডিরেক্টরকে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়ে চিঠি লিখলেন তিনি। কয়েকদিনের মধ্যেই সে চিঠির জবাব পাওয়া গেল।

ডিরেক্টর লিখেছেন, 'আপনি জানতে চেয়েছেন, চাঁদে গোলা পাঠানো সম্ভব কিনা। এর উত্তরে আমি বলব হ্যাঁ, সম্ভব। তবে সে-গোলাটার গতিবেগ সেকেন্ডে কমপক্ষে বারো হাজার গজ হওয়া চাই।

'চাঁদে গোলাটা পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে, একটু ব্যাখ্যা করে তা বুঝিয়ে দিচ্ছি; যে জায়গায় পৃথিবীর আর চাঁদের আকর্ষণ সমান সমান সেখানে গোলাটার পৌঁছতে লাগবে তিরাশি ঘণ্টা বিশ মিনিট। আর সেখান থেকে চাঁদে পৌঁছতে আরও তেরো ঘণ্টা তিপ্পান্ন মিনিট কুড়ি সেকেন্ড লেগে যাবে। অর্থাৎ গোলাটাকে আপনি চাঁদের মাটিতে যে সময় ফেলতে চান, তার সাতানব্বই ঘন্টা তেরো মিনিট কুড়ি সেকেন্ড আগে কামান দাগতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এত বেশি সময় লাগার কারণ কি? এর উত্তরে বলতে পারি, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আর বায়ুমণ্ডলই এজন্যে দায়ী। এ দু'টে ই গোলার গতিকে খানিকটা দাবিয়ে দিতে চাইবে।

'আপনার তৃতীয় প্রশ্ন ছিল পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব নিয়ে। এ কথা প্রায় সকলেই জানে, চাঁদ ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর কখনও খুব কাছে চলে আসে; তখন পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব থাকে দু'লক্ষ আঠারো হাজার সাড়ে ছ'শো মাইল। আবার ঘুরতে ঘুরতে চাঁদটা যখন সবচাইতে দূরে সরে যায়, তখন পৃথিবী আর চাঁদের মধ্যে দূরত্ব থাকে আড়াই লক্ষ মাইলের সামান্য কম।

'কামান দাগার জন্যে সবচাইতে সুবিধাজনক সময় হচ্ছে আগামী বছরের পয়লা ডিসেম্বর। প্রতি মাসের কোন এক সময়ে চাঁদ পৃথিবীর খুব কাছাকাছি চলে আসে।

তবে এর মধ্যে বহু বছর পর পর কোন মাসে Zenith বা সুবিন্দু বরাবর চলে আসে চাঁদ। এবারে জেনিথ সম্পর্কে দু'চার কথা বলা যাক। ধরুন, আপনি উত্তর মেরুর একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু থেকে একটা সরল রেখা কল্পনা করে সেটা উত্তর মেরুর কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে বের করুন; তারপর সেই রেখাটা আপনার শরীরের ভেতর দিয়ে গিয়ে মাথা ছেদ করে অসীম আকাশে–সোজাসুজি গিয়ে ঠেকেছে (কল্পনা করুন)। এখন এই রেখাটা আকাশটাকে যে জায়গায় গিয়ে স্পর্শ করবে, তাকেই বলা হয় জেনিথ। যে মাসে চাঁদ জেনিথ বরাবর চলে আসে–পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব সেই মাসেই সবচেয়ে কম হয়। আগামী বছরের ৪ ডিসেম্বর বহু বছর পরে ঠিক এমনই একটা অবস্থার সৃষ্টি হতে চলেছে। কিন্তু সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইলে কামান দাগতে হবে পয়লা ডিসেম্বর রাত দশটা বেজে ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডের সময়। এ সময়টা হাতছাড়া করলে পরবর্তী সুযোগের জন্যে আরও আঠারো বছর অপেক্ষা করতে হবে।

'কামান দাগার জন্যে উপযুক্ত হচ্ছে, উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষরেখার শূন্য থেকে আটাশ ডিগ্রীর মধ্যেকার যে-কোন জায়গা। অন্য কোন জায়গা থেকে কামান দাগলে টিপ সঠিক হবে না। এতে গোলাটা চাঁদে না পৌঁছে অসীম মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে।

'সবশেষে আরও দুটো জরুরী কথা বলতে চাই। চাঁদ প্রতিদিন তেরো ডিগ্রী দশ মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড পথ পাড়ি দেয়। জেনিথ থেকে চাঁদটা যখন চৌষট্টি ডিগ্রী দূরে থাকবে, কামানটা দাগতে হবে ঠিক তখনি–অর্থাৎ পয়লা ডিসেম্বর রাত দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডে।'

চার

কেমব্রিজ মানমন্দিরের চিঠিটা পড়ে শরীরে যেন বল ফিরে পেলেন বার্বিকেন। এর কয়েকদিন পর ক্লাবের স্থায়ী সদস্যদের এক জরুরী মীটিং ডেকে কয়েকটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হল।

গোলাটা কি দিয়ে তৈরি করা হবে এ নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটির পর সবাই একমত হল যে, অ্যালুমিনিয়ামই এর জন্যে উপযুক্ত ধাতু। লোহা কিংবা পিতল দিয়ে তৈরি করলে ওজন অনেক বেশি হয়ে যাবে। লোহা দিয়ে যদি গোলাটা তৈরি হয় তবে সেটার ওজন হবে প্রায় সত্তর হাজার পাউন্ড কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামে ওজন দাঁড়াচ্ছে মাত্র কুড়ি হাজার পাউন্ডের মত। এর জন্যে খরচ হবে প্রায় তেয়াত্তর হাজার ডলার। গোলাটার ব্যাস কত হবে, এ নিয়ে হিসেব নিকেশ করে দেখা গেল, কিছুতেই তা নয় ফুটের কম হলে চলবে না–কারণ এর চাইতে কম হলে পৃথিবীর সেরা দূরবীন চোখে লাগিয়েও তার নাগাল পাওয়া যাবে না। মাধ্যাকর্ষণ ছেড়ে যাবার সময় প্রচণ্ড তাপেও যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেজন্যে গোলাটাকে বারো ইঞ্চি পুরু করে তৈরি করতে হবে।

এ তো গেল গোলার কথা। এত বড় গোলা ছুঁড়তে হলে কামানটাকেও মানানসই রকমের বড় করে তৈরি করা চাই। সদস্যদের অনেকেই কামানের সাইজ নিয়ে অনেক কথা বলল। কিন্তু বার্বিকেন আঁক-জোখ করে বললেন, কামানের ব্যারেল হবে ন'শো ফুট লম্বা। একথা শুনে একেকজনের চোখ কপালে উঠল। প্রেসিডেন্ট বলেন কি!

বার্বিকেন এ ব্যাপারে সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন, 'সেকেন্ডে বারো হাজার গজ যেতে পারে, এমন কোন গোলা যদি চাঁদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেয়া হয় তবে তা মাধ্যাকর্ষণ এবং বাতাসের কাছে বাধা পায়। এই দুইয়ে মিলে গোলাটাকে পৃথিবীর বুকে ঠেলে ফেলতে চাইলেও বারুদ পোড়া শক্তির সঙ্গে তা সহজে পেরে উঠবে না। বারুদের এ শক্তি আরও বেড়ে যাবে যদি ব্যারেলটাকে প্রয়োজনমত লম্বা করে তৈরি করা যায়।

'প্রথম ধাক্কায় চল্লিশ মাইল নির্বিঘ্নে পেরুতে পারলেই বাতাসের দাপট আর খাটবে না–কারণ এরপর বায়ুমণ্ডল নেই; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের ঝামেলাটা থেকেই যাচ্ছে। এ ব্যাপারে বইপত্র ঘেঁটে জেনেছি, কোন জিনিস যতই ওপরে উঠতে থাকবে ততই তার ওজনও কমতে থাকবে–দূরত্বের যে বর্গ, তার উল্টো অনুপাতে। কাজেই গোলার বেগ আনুপাতিক হারে বাড়াতে পারলে মাধ্যাকর্ষণকেও পেরিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না। এ সবকিছুই নির্ভর করছে কামানের ব্যারেল কতটা লম্বা হবে তার উপর। ব্যারেলটা যত বেশি লম্বা হবে, বারুদ পোড়া গ্যাসের শক্তি ততই বেড়ে যাবে। তবে সেই সঙ্গে বারুদের পরিমাণও অনুপাতে বেশি হওয়া চাই। আর হ্যাঁ, কামানটা ঢালাই লোহায় তৈরি হবে। এতে খরচও কম এবং ওজনেও হালকা। ব্যারেলের ভেতরকার ব্যাস হবে ন'ফুট আর তা ছ'ফুট পুরু করে তৈরি করতে হবে।

'মানলাম; কিন্তু ঢালাই লোহা তো বেশ ঠুনকো, যদি হঠাৎ ভেঙে যায়?' সদস্যদের একজন বলে উঠল।

'সেটা আমিও ভেবে দেখেছি,' বললেন বার্বিকেন। 'কিন্তু এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই; কারণ কামান দাগার সময় যে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হবে তাতে ঢালাই লোহা ছাড়া অন্য যে-কোন ধাতুই গলে যেতে পারে। আর কামান একবার তৈরি হয়ে গেলে সেটাকে সাবধানে দেখে রাখলেই ভেঙে যাবার ভয়টা আর থাকছে না।'

ম্যাস্টন এরই মধ্যে কামানের ওজন আর তৈরি করার খরচটা হিসেব করে ফেলল। সে বলল, 'কামানের ওজন হবে প্রায় আটষট্টি হাজার চল্লিশ টন আর এতে খরচ পড়বে পঁচিশ লাখ দশ হাজার সাতশো ডলার।'

গোলা আর কামানের ব্যাপারে সবাই একমত হল! এবারে বারুদ। ম্যাস্টন বলল, 'আমাদের ষোলো লাখ পাউন্ড বারুদের প্রয়োজন। এ বারুদ পুড়িয়ে ছ'শো কোটি লিটার গ্যাস পাওয়া যাবে। এদিকে সমস্ত ব্যারেলটুকুর মধ্যে আমরা পাচ্ছি মাত্র চুয়ান্ন হাজার ঘনফুট জায়গা। বারুদ ঠাসতেই লাগবে বাইশ হাজার ঘনফুট। এখন কথা হচ্ছে, যদি বারুদেই প্রায় অর্ধেক জায়গা লেগে যায় তাহলে বারুদ পুড়ে যে গ্যাসটা তৈরি হবে সেটা থাকবে কোথায়? আর গ্যাস যদি ঠিকমত তৈরি না হয় তাহলে গোলাটা খুব জোরের সঙ্গে ছোঁড়া যাবে না।'

সদস্যদের চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল।

বার্বিকেনকে কিন্তু একটুও চিন্তিত মনে হল না। তিনি বললেন, 'গাছ, লতাপাতায় অসংখ্য কোষ থাকে একথা আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি এবং খাঁটি কোষ উপাদান কেবল তুলোর মধ্যেই পাওয়া যায়। আমরা এই তুলোকে কাজে লাগাব। নাইট্রিক অ্যাসিডে পনেরো মিনিট চুবিয়ে তারপর শুকিয়ে নিলেই তুলো দারুণ শক্তিশালী বিস্ফোরকের কাজ করে। বারুদ জ্বলতে লাগে দু'শো চল্লিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কিন্তু তুলো মাত্র একশো সত্তর ডিগ্রী উত্তাপেই জ্বলতে পারে। বারুদের চেয়ে এর শক্তি চারগুণ বেশি। তুলোর সঙ্গে যদি খানিকটা নাইট্রেট অব পটাশ ভরে দেয়া যায় তাহলে গ্যাসের জোর অনেক বেড়ে যাবে।

'ষোলো লাখ পাউন্ড বারুদের বদলে আমাদের লাগছে মাত্র চার লাখ পাউন্ড তুলো। কঠিন চাপে পাঁচশো পাউন্ড তুলোকে মাত্র সাতাশ ঘনফুটের মধ্যে রাখা যায়। আমাদের সবটুকু তুলোর জন্যে একশো আশি ঘনফুট জায়গাই যথেষ্ট। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ছ'শো কোটি লিটার গ্যাসের জন্যে যতটুকু জায়গার প্রয়োজন তার অভাব হবে না।'

বার্বিকেনের এ যুক্তি সবাই এক কথায় মেনে নিল। আর দেরি না করে প্রেসিডেন্ট মীটিঙের সমাপ্তি টানলেন।

এতকিছুর পরেও সমস্যা থেকেই গেল এবারে, কামান কোথায় তৈরি হবে, অর্থাৎ গোলাটা কোথা থেকে ছোঁড়া হবে, এ নিয়ে সদস্যদের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হল। শেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হল–টেক্সাস কিংবা ফ্লোরিডা–এ দুয়ের মধ্যে কোন একটা জায়গাকে বেছে নিতে হবে। কিন্তু বেছে নেয়া কি অতই সহজ? ফ্লোরিডা আর টেক্সাসের লোকেরা আলাদা আলাদা মিছিল করে গান ক্লাবে ভিড় জমাল। দু'দলের তর্ক শুনতে শুনতে ক্লাবের সবার কান ঝালাপালা হবার জোগাড়! টেক্সাসের লোকেরা বলে: কামান দাগব আমরাই; কারণ আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন চাঁদের বাসিন্দা। ফ্লোরিডার লোকেরাও কম যায় না। তারা বলে: আমরাই গোলাটা ছুঁড়ব, ফ্লোরিডা তো এককালে চাঁদেরই একটা প্রদেশ ছিল।

তর্কাতর্কি হাতাহাতির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকল। শেষে ধীরস্থির বার্বিকেন ব্যাপারটার চমৎকার সুরাহা করলেন। সবাইকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'আপনারা আমার কথা দয়া করে একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। কেমব্রিজ মানমন্দিরের পরামর্শেই এ দুটোর মধ্যে যে-কোন একটা জায়গাকে বেছে নেয়ার কথা ভেবেছি। দুটো জায়গাই কামান দাগার জন্যে চমৎকার। কিন্তু তবুও আমি ফ্লোরিডাকেই বেছে নিচ্ছি। কারণ ফ্লোরিডায় একটামাত্র শহর আর টেক্সাসে এগারোটা। টেক্সাস থেকে গোলাটা ছুঁড়তে চাইলে কোন একটা বিশেষ শহর থেকে তা ছুঁড়তে হবে–এবং তখনই রক্তারক্তি বেধে যাবে। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ শহর থেকে কামান দাগাতে চাইবে; কিন্তু তা তো সম্ভব নয়।'

বার্বিকেনের কথা শেষ হতে না হতেই ফ্লোরিডার লোকেরা উল্লাসে ফেটে পড়ল। টেক্সাসের লোকেরা মুখে কিছু না বললেও বোঝা গেল, তারা ভিষণ ব্যাজার হয়েছে।

কেবলমাত্র আমেরিকাতেই নয়; কামান ছোঁড়ার ব্যাপারে বার্বিকেনের মতামত কাগজে ছাপা হতেই পৃথিবী জুড়ে হুলস্থুল কাণ্ড বেধে গেল। অনেকের মতে, অতবড় গোলা নাকি বানানোই যাবে না; আর বানানো গেলেও কামানে ঢোকানোর সময় এর ওজনেই কার্তুজগুলি একসঙ্গে জ্বলে উঠবে–আর সঙ্গে সঙ্গে কামানটাও ছাতু হয়ে যাবে। কেউ কেউ আবার বলল, ন'শো ফুট লম্বা কামান না ছাই! স্রেফ ধাপ্পাবাজি! যারা এসব কথা বলে বেড়াল, তাদের চেয়ে বহুগুণে বড় আর একটা দল বার্বিকেনের মতামতকে এক কথায় মেনে নিয়ে বলল, এ শতাব্দীতে জন্মেও চাঁদে গোলা ছোঁড়ার কথা যারা অবিশ্বাস করে–জঙ্গলই তাদের জন্যে একমাত্র জায়গা!

যাঁকে নিয়ে এত হৈ হট্টগোল, সেই বার্বিকেন কিন্তু এসব ব্যাপারে একেবারেই নির্বিকার। মুখ দেখে কিছু আন্দাজ করা, অন্তত বার্বিকেনের বেলায় যায় না। সবসময় ধীরস্থির–কোন কারণেই আজ পর্যন্ত কেউ তাকে উত্তেজিত হতে দেখেনি। এবারে পরিকল্পনামাফিক কাজটাকে কিভাবে সুসম্পন্ন করা যায় তার একটা কাঠামো খাড়া করতে লেগে গেলেন তিনি। আর ঠিক সে-সময়েই এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে বার্বিকেনের মত নির্বিকার লোকও খানিকটা বিপাকে পড়তে বাধ্য হলেন।

নিকল। লোকে তাকে ক্যাপ্টেন নিকল নামেই জানে। গান ক্লাবের সভ্য নন। কিন্তু কামান আর গোলাবারুদ তৈরিতে তিনি দারুণ ওস্তাদ। বেপরোয়া এবং দুর্দান্ত সাহসী হিসেবেও তার দেশজোড়া সুনাম।

বার্বিকেন আর নিকল–দুজনের সম্পর্ক যেন আদায় কাঁচকলায়! একজন আরেকজনের কথা শুনলেই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। ভুলেও কেউ কারও নাম মুখে আনেন না। এসব কথা শোনার পর যদি বলা হয়, জীবনে এরা কেউ কাউকে দেখেনইনি তাহলে অবাক না হয়ে আর উপায় কি! সত্যিই তাই। যুদ্ধের সময় দু'জন দু'জায়গায় ছিলেন। একজন নতুন একটা কামান তৈরি করলেই অন্যজন হিংসায় জ্বলে মরতেন। এদিক দিয়ে ক্যাপ্টেন নিকল ছিলেন কয়েকগুণে বাড়া। বার্বিকেনের বিন্দুমাত্র প্রশংসা তিনি সহ্য করতে পারতেন না; বরং সুযোগ পেলেই তাঁর নামে যা তা বলে বেড়াতেন। বার্বিকেনও মনে মনে নিকলকে দারুণ অপছন্দ করতেন; কিন্তু মুখে তা কখনই প্রকাশ পেত না। বরং তাঁর সম্বন্ধে নিকলের মন্তব্য কিংবা সমালোচনা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখতেন।

বার্বিকেনের চাঁদে গোলা পাঠানর কথা শোনার পর থেকে ক্যাপ্টেন নিকলের মেজাজটা যেন আরও খাপ্পা হয়ে উঠল। এ পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্যে আদাজল খেয়ে নেমে পড়লেন তিনি। প্রথমেই বিজ্ঞানীদের সভা ডাকলেন। নানারকম ফর্মূলা দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন, বার্বিকেনের এ খেয়াল আসলে পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়। এসব শুনে বার্বিকেন মোটেই দমলেন না; বরং আরও জোরেশোরে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এ দেখে নিকল আরও খেপে উঠলেন। কামান তৈরির বিরুদ্ধে এবার গভর্নমেন্টকে উশকে দিতে চেষ্টা করলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন, কামান দাগার সময় যদি তা ফেটে যায় তাহলে বহু লোক মারা যাবে এবং ঘরবাড়িরও ক্ষয়ক্ষতি হবে। কিন্তু এ যুক্তি ধোপে টিকল না। কর্মকর্তারা বললেন, কামানের ব্যারেলটা এত পুরু করে তৈরি করা হচ্ছে যে ফেটে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

এতেও নিকল দমলেন না। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখে চললেন বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে ঠাসা একেকটা জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ। উদ্দেশ্য–জনমত ঘুরিয়ে দিয়ে বার্বিকেনকে সবার চোখে খাটো করা। কিন্তু লোকজন নিকলের প্রবন্ধগুলো পড়েও দেখল না।

যখন কিছুতেই কামান তৈরি করা ঠেকানো গেল না, নিকল তখন আরেক ফন্দি আঁটলেন। খবরের কাগজ মারফত বার্বিকেনকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি এক অদ্ভুত বাজি ধরলেন:

(১) গান ক্লাবের এ পরিকল্পনার জন্যে যত টাকা লাগবে তা কোনদিনই জোগাড় হবে না। বাজি: এক হাজার একশো পঁচিশ ডলার।

(২) ন'শো ফুট লম্বা কামান কিছুতেই ঢালাই করা সম্ভব হবে না। বাজি: দু'হাজার দু'শো পঞ্চাশ ডলার।

(৩) চাঁদে ছোঁড়ার আগেই গোলার ওজনে বারুদ আপনা থেকেই জ্বলে উঠবে–সুতরাং কামানে বারুদ ঠাসা যাবে না। বাজি: তিন হাজার তিনশো পঁচিশ ডলার।

(৪) বারুদে আগুন দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কামানটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। বাজি: সাড়ে চার হাজার ডলার।

(৫) বারুদে আগুন দেয়ার পর কামানটা অক্ষত থাকলেও, চাঁদ তো দূরের কথা, গোলাটা মাইল দশেকও পেরুতে পারবে না। বাজি: পাঁচ হাজার ডলার।

বার্বিকেনের কামান থেকে ছোঁড়া কুড়ি হাজার পাউণ্ড ওজনের গোলাটা যদি দশ মাইলের কাছাকাছিও যায়, তবুও তাঁকে মোট ষোলো হাজার দু'শো ডলার নগদ দিতে ক্যাপ্টেন নিকল বাধ্য থাকবেন।

এ ঘটনার কয়েকদিন পরে নিকল গান ক্লাবের মনোগ্রাম মার্কা খামে একটা চিঠি পেলেন।

চিঠিতে শুধু একটা লাইনই লেখা ছিল: (স্বাক্ষর)

'আমিও বাজি ধরলাম।'

ইম্পে বার্বিকেন,
প্রেসিডেন্ট, গান ক্লাব।

পাঁচ

বাজে সময় নষ্ট করা বার্বিকেনের ধাতে সয় না। এমনিতেই তিনি বেজায় করিৎকর্মা, তার ওপর ক্যাপ্টেন নিকলের চ্যালেঞ্জ তাঁর কাজের উৎসাহকে হাজার গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

বার্বিকেন জানতেন, তাঁর পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে হলে বহু টাকার প্রয়োজন। তাই আর দেরি না করে পৃথিবীর সমস্ত দেশের কাছে চাঁদার জন্যে হাত পাতলেন তিনি। তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্যে সবাই যেন একপায়ে খাড়া ছিল! পৃথিবীর সব দেশ থেকে গান ক্লাবের নামে টাকা আসতে শুরু করল। কয়েকদিন

পরে হিসেব করে দেখা গেল দেশের এবং বিদেশের চাঁদা মিলিয়ে প্রায় পঞ্চান্ন লাখ ডলার ক্লাবের ফান্ডে জমা হয়েছে। এ দিয়ে কামান এবং গোলা তৈরির পরও বহু টাকা বেঁচে যাবে-অর্থাৎ ক্যাপ্টেন নিকল এক নাম্বার বাজিতে হেরে গেলেন।

টাকার জোগাড় হয়ে গেলে বার্বিকেন এবার আসল কাজে মন দিলেন। নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত গোল্ড স্প্রিং কোম্পানিকে তিনি কামান তৈরির ভার দিলেন। অন্য আরেকটা নাম করা কোম্পানি একরকম জোর করেই বার্বিকেনের কাছ থেকে বিরাট গোলা তৈরির কাজটা বাগিয়ে নিল। প্রকাণ্ড একটা টেলিস্কোপ তৈরির দায়িত্ব পড়ল কেমব্রিজ মানমন্দিরের ওপর।

কয়েকদিন পর বার্বিকেন ক্লাবের কয়েকজন সদস্য এবং গোল্ড স্প্রিং কোম্পানির ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে কামান ঢালাইয়ের জায়গা বাছাই করতে ফ্লোরিডায় গেলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর স্টোনহিল পাহাড়ের জঙ্গল ঘেরা এলাকা সবার মনে ধরল। জায়গাটা ফ্লোরিডার টাম্পা শহর থেকে পনেরো মাইল দূরে। বহু বছর আগে থেকেই এ এলাকায় রেড ইন্ডিয়ানদের আস্তানা। বার্বিকেন এবং তাঁর দলবলের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তারা দারুণ খাপ্পা হয়ে উঠল। কয়েকদিন রাতের অন্ধকারে গুলিগোলা ছুঁড়ে ভয় দেখানরও চেষ্টা করল, কিন্তু বার্বিকেন এসবে মোটেও দমলেন না–তিনি একমনে কাজ করে চললেন।

ঝোপজঙ্গল সাফ করে কামান ঢালাইয়ের জন্যে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। এ কাজের জন্যে প্রায় দু'হাজার মজুর কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। গোটা কাজের তদারকিতে রইলেন ইঞ্জিনিয়ার মার্চিসন।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সবকিছু যেন রাতারাতি পাল্টে গেল। ঝোপ-জঙ্গলে ঘেরা স্টোনহিলের মাটি ফুঁড়ে হঠাৎ যেন ছোটখাট একটা শহর গজিয়ে উঠল। কাজের সুবিধা হবে ভেবে টাম্পা থেকে স্টোনহিল পর্যন্ত বসানো হল পনেরো মাইল লম্বা রেলপথ। টাম্পা থেকে মালগাড়ি বোঝাই করে আনা হল ক্রেন, বয়লার, চুলো আর নানারকম যন্ত্রপাতি–একই সঙ্গে এল অসংখ্য শাবল, গাঁইতি, কোদাল আর হাতুড়ি পেরেক।

নভেম্বরের এক তারিখে বার্বিকেন স্টোনহিলে এসে দেখলেন, মার্চিসন এরই মধ্যে ছোট শহরটাকে কাঠের দেয়াল দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন। মজুর, কামার, মিস্ত্রি, ছুতোর–এদের জন্যে গড়ে উঠেছে হালফ্যাশনের কোয়ার্টার। এ ছাড়াও বিভিন্ন কাজের জন্যে এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও কয়েকশো ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়েছে। গোটা শহরটার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত বিজলী বাতির চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে। মনে মনে মার্চিসনের কাজের তারিফ না করে পারলেন না তিনি।

ওই দিনই বিকেলে মজুরদের এক সভা ডাকা হল। সভায় বার্বিকেন তাঁর বক্তৃতায় বললেন, 'কর্মী ভায়েরা, তোমরা সবাই জান গান ক্লাব ন'শো ফুট লম্বা একটা কামান তৈরি করতে চলেছে। কি উদ্দেশ্যে এ কামান তৈরি করা হচ্ছে, সে-কথাও তোমাদের অজানা নেই। কাজটা খুবই কঠিন, কিন্তু এ কঠিন কাজও পানির মত সহজ বলে মনে হবে–যদি তোমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাও। একাজের জন্যে ষাট ফুট গোল আর ন'শো ফুট গভীর কুয়ো খুঁড়তে হবে–কারণ কামানটা খাড়াভাবে আকাশের দিকে মুখ করে থাকবে। ঢালাইয়ের জন্যে সাড়ে

উনিশ ফুট পুরু সিমেন্টের দেয়ালও তৈরি করতে হবে। গোটা কামানটাকে ঘিরে রাখবে ওই দেয়াল। আট মাসের মধ্যে এ কাজ শেষ করতে হবে। প্রতিদিন যদি দু'হাজার ঘনফুট করে মাটি কাটা যায় তাহলেই পুরো কাজটা সময়মত শেষ করা যাবে।

'এখন এর সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা–সবকিছুই নির্ভর করছে তোমাদের ওপর। ইঞ্জিনিয়ার মার্চিসন যেভাবে বলবেন, তোমরা যদি টুঁ শব্দ না করে সেভাবে কাজ করে যাও তাহলে সফল আমরা হবই। চাঁদে অভিযানের ইতিহাস যেদিন লেখা হবে সেদিন তোমরাও তা থেকে বাদ পড়বে না।'

বার্বিকেনের বক্তৃতায় শ্রমিকেরা যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেল। সবরকম ভয়ভীতি মন থেকে দূর করে দিয়ে দিনরাত কাজ করে যেতে লাগল তারা। ওক কাঠের তৈরি বিরাট একটা চাকতির ওপর শ্রমিকেরা সিমেন্টের দেয়াল গড়তে লেগে গেল–একই সঙ্গে চলল মাটি কাটার কাজ। এ কাজ করতে গিয়ে বহু শ্রমিক জখম হল, কেউ কেউ মারাও গেল। তবুও তারা দমল না। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আর মেশিনের ঘটাং ঘটাং আওয়াজের একমুহূর্ত যেন বিরাম নেই। দিনরাত সব ভুলে গিয়ে শ্রমিকেরা একটানা কাজ করে চলল। বেজায় শক্ত চাকতির ওপর যে দেয়ালটা তৈরি হচ্ছিল, মাটি কাটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটু একটু করে তা নিচে নামতে লাগল।

মাত্র তিন মাসেই কুয়োটা সাড়ে তিনশো ফুট গভীরে পৌঁছল। আর দশই জুন তারিখে তা ন'শো ফুট গভীরে গিয়ে ঠেকল। ওই দিন ক্লাবের সমস্ত সদস্য নতুন করে আমোদ ফুর্তিতে মেতে উঠল।

ছয়

কুয়ো খোঁড়ার কাজ শেষ হবার পর ন'শো ফুট লম্বা এবং ন'ফুট ব্যাসের একটা চোঙ তৈরির কাজে হাত দেয়া হল। চোঙ আর সিমেন্টের দেয়ালের মধ্যে ছ'ফুট ফাঁকা থাকবে। এখন লোহা গলিয়ে ওই ফাঁকা জায়গা ভরে দিলেই চমৎকার একটা কামান তৈরি হয়ে যাবে। চোঙটা বেশ পুরু হওয়া চাই, তা নাহলে ঢালাইয়ের সময় তা ভেঙে যেতে পারে–একথা মনে রেখেই মার্চিসন খড় এবং কাদামাটি দিয়ে চোঙটা তৈরি করতে বললেন। এ কাজে সময় লাগল মাত্র কয়েক সপ্তাহ।

এর পর কামান ঢালাইয়ের পালা। গোল্ড স্প্রিং কোম্পানি মোট আটষট্টিটা জাহাজ বোঝাই করে কেবল লোহাই আনল সত্তর হাজার টন। ওই লোহাকে এর আগে একবার গলিয়ে কয়লা আর বালিমাটির ওপর ঢালা হয়েছিল; এখন কামান ঢালাইয়ের জন্যে আবার একে গলাতে হবে।

ঢালাইয়ের দিন সারা স্টোনহিল জুড়েই যেন অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়ে গল। বিরাট কুয়োটাকে মাঝখানে রেখে ছ'শো ফুট দূরে তিন ফুট করে ফাঁক রেখে বারোশো চুলো ঠিক যেন গোল একটা দাবানলের মতই জ্বলছিল। পরিষ্কার আকাশটা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। প্রত্যেকটা চুলোয় প্রকাণ্ড একেকটা ড্রামে

লোহা টগবগিয়ে ফুটছে। সব ক'টা ড্রাম থেকে যাতে একসঙ্গে লোহা ঢেলে দেয়া যায় সেজন্যে চুলো থেকে কুয়ো পর্যন্ত মোট বারোশো নালা আগেভাগেই ঢালু করে খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। এবারে ঠিক হল, বারোটার ঘণ্টা বাজলেই একবার মাত্র কামান দেগে সঙ্কেত দেয়া হবে–সঙ্গে সঙ্গে বারোশো ড্রাম থেকে টগবগে লোহার স্রোত একসাথে কুয়োর দিকে ছুটবে।

দুপুর প্রায় বারোটা। ছোট একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে বার্বিকেন ঢালাইয়ের সমস্ত আয়োজন দেখছেন। ঘড়ির কাঁটার দিকে বারবার চোখ চলে যাচ্ছে তাঁর। বারোটার ঘণ্টা বাজতেই কামান দেগে দেয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে বারোশো নালা বেয়ে লাভার স্রোত যেন ছুটে চলল। টগবগে লোহা মাটি কাঁপিয়ে পাহাড়ী নদীর মতই ধেয়ে চলল কুয়োটার দিকে। লালচে ধোঁয়ায় আর একবার ঢেকে গেল আকাশটা।

কামান ঢালাইয়ের কয়েক দিন পরেও কুয়োর ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতে পারল না। দু'একজন বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে গা হাত পা ঝলসিয়ে ফিরে এল। ম্যাস্টনও কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে একদিন একাই কামানটা দেখতে গেল, কিন্তু কুয়োর দু'শো গজের মধ্যে যেতেই তার রবারের জুতো গলে গিয়ে মাটির সঙ্গে লেপ্টে গেল। কাঠের পা'টা জুতোসুদ্ধ আটকে গেল মাটিতে। কিছুতেই তা টেনে তোলা যাচ্ছিল না। ভাগ্য ভাল যে দূর থেকে কর্নেল ব্লুমসবি ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল; একদৌড়ে ছুটে এসে প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টানে ম্যাস্টনের কাঠের পা'টাকে ছাড়িয়ে দিল সে। এ ঘটনার পর বার্বিকেন আর দেরি করলেন না–কুয়োর দু'শো গজের মধ্যে যাতে কেউ যেতে না পারে সেজন্যে পাহারা বসালেন তিনি।

আরও কিছুদিন পর কুয়োর চারপাশের এলাকাটা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে এল। এবারে কামানটাকে পরখ করে দেখার পালা। বার্বিকেন ছাড়া সকলেরই চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। কে জানে, কামানটা যদি ঠিকভাবে তৈরি না হয়ে থাকে তাহলে আঠারো বছরের মধ্যে চাঁদে গোলা পাঠানর এমন সুযোগ আর আসবে না। দুরু দুরু বুকে সবাই কুয়োর ধারে জমায়েত হল। কামানটায় কোন খুঁত আছে কিনা তা ওপর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। খড় আর কাদামাটির তৈরি ছাঁচটা উপড়ে ফেলার পরই তা বুঝতে পারা যাবে।

ছাঁচটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ক্রেন দিয়ে টেনে বের করতেই লেগে গেল আরও কয়েকটা দিন। এরপর চলল ব্যারেলের ভেতরটা ঘসে-মেজে পরিষ্কার করার কাজ। বাইশে সেপ্টেম্বর দেখা গেল, কুয়োর মুখ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে চমৎকার ঝকঝকে একটা কামান। গোটা কামানটা একদম নিখুঁতভাবে তৈরি হয়েছে দেখে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। খবরটা ক্যাপ্টেন নিকলেরও কানে গেল; প্রচণ্ড রাগে বোমার মত ফেটে পড়লেন তিনি। এখানে একটা কথা মনে করিয়ে দেয়া দরকার–দু'নাম্বার বাজিতেও বার্বিকেনের কাছে হেরে গেলেন নিকল।

তেইশে সেপ্টেম্বর পাহারা তুলে নিতেই টাম্পার হাজার হাজার কৌতূহলী মানুষ একনজর কামানটাকে দেখার জন্যে স্টোনহিলে এসে ভিড় জমাল। আমেরিকার অন্যান্য এলাকার লোকজনও যাতে কামান দেখার সুযোগ পায় সেজন্যে স্টোনহিলে আরও কয়েকটা নতুন রেলপথ বসানো হল। কয়েকদিনের মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াল

যে রাস্তাঘাটে হাঁটাচলার জো রইল না। লাখ লাখ মানুষের চোখেমুখে শুধু একটাই প্রশ্ন–সত্যিই কি চাঁদে গোলা ছোঁড়া হচ্ছে!

শুধুমাত্র ওপরটুকু দেখেই লোকজনের মন ভরল না–কামানের ভেতরে নেমে দেখার জন্যে এবারে বায়না ধরল তারা। এরকম একটা প্রস্তাবের জন্যে বার্বিকেন মনে মনে যেন তৈরিই ছিলেন। ভোজবাজির মত এসে গেল বড় বড় কয়েকটা কপিকল; সঙ্গে গদিমোড়া চেয়ার জুড়ে দিয়ে টিকেটের দাম ধরা হল মাথাপিছু এক ডলার–আর এ থেকে ক্লাবের ফান্ডে জমা হল প্রায় পাঁচ লাখ ডলার।

কয়েকদিন পরে ন'শো ফুট নিচের পাতালপুরীতে গান ক্লাবের তরফ থেকে এক অদ্ভুত ভোজসভার আয়োজন করা হল। এতে ক্লাবের হোমরাচোমরারা এবং অন্যান্য গণ্যমান্য লোকেরা আমন্ত্রিত হয়ে এলেন। বিজলীবাতির আলোয় কামানের ভেতরটাকে মনে হচ্ছিল যেন রোদ ঝলমলে দিন।

খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ হতেই একসঙ্গে সবাই স্লোগান দিয়ে উঠল–'আমেরিকা জিন্দাবাদ। গান ক্লাব জিন্দাবাদ।' ওপরে যারা ছিল তারাও তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে স্লোগান তুলল। হাজার হাজার লোকের চিৎকার আর চেঁচামেচিতে মনে হল যেন এই বুঝি কামানটা আপনা থেকেই দেগে উঠবে।

পাতালপুরীর ভোজ খেয়ে অতিথিরা একে একে ওপরে উঠে এলেন। কিন্তু ম্যাস্টন রয়ে গেল নিচে। এমনিতেই সে একটু খ্যাপাটে, তার ওপর কয়েক ঢোক মদ বেশি গিলে ফেলায় মুখে যেন কথার খৈ ফুটতে শুরু করল। সে বলল, 'গোটা পৃথিবীর বাদশাহী পেলেও এ জায়গা ছেড়ে আমি একচুলও নড়ছি না; কামান দাগার ভয় দেখিয়েও কেউ আমাকে এখান থেকে নড়াতে পারবে না। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে, তাহলে দাগো দেখি তোমাদের কামান!'

ভাবগতিক বেশি সুবিধের নয় বুঝতে পেরে ম্যাস্টনের সঙ্গে বার্বিকেনও পাতালপুরীতে রয়ে গেলেন। বেশ অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর দেখা গেল, তাঁরা দুজনেই ওপরে উঠে আসছেন। ম্যাস্টনের নেশার ঘোর ততক্ষণে পুরোপুরি কেটে গেছে।

ওপরে উঠে বার্বিকেন দেখলেন একজন বেয়ারা একটা টেলিগ্রাম হাতে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। খামটা খুলে ভেতরের কাগজটায় চোখ বুলোতেই চেহারা পাল্টে গেল তাঁর। সবাই লক্ষ করল, ভীষণ শীতেও তাঁর কপাল ঘেমে উঠেছে। পর পর কয়েকবার কাগজটায় চোখ বুলোনর পর তিনি সেটা ম্যাস্টনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এ টেলিগ্রামের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না; তুমি একবার পড়ে দেখ তো, কিছু বুঝতে পার কিনা।'

টেলিগ্রামটা এরকমঃ

প্যারিস, ফ্রান্স।
সেপ্টেম্বর ৩০

ইম্পে বার্বিকেন। টাম্পা। ফ্লোরিডা। আমেরিকা। 'যে গোলাটা চাঁদে পাঠানর জন্যে তৈরি করা হচ্ছে সেটা একেবারে গোল না বানিয়ে দয়া করে ফাঁপা ডিমের মত করে তৈরি করুন। ওই গোলার ভেতরে করে আমি চাঁদে যাব। এস এস আটলান্টা'র টিকেট কেটেছি। জাহাটা আজই লিভারপুল ছেড়ে টাম্পার দিকে রওনা দিচ্ছে।'

মাইকেল আর্দাঁ

সাত

কিছুক্ষণের মধ্যে আমেরিকার এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত যেন হাওয়ায় ভর করে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। রাস্তাঘাটে, অফিস আদালতে, বারে কিংবা রেস্টুরেন্টে–সব জায়গায় একই কথা: কামানের গোলায় চেপে চাঁদে নাকি মানুষ যাচ্ছে! তা-ও আবার যে সে লোক নয়; এ যুগের শ্রেষ্ঠ ফরাসী বিজ্ঞানী মাইকেল আর্দাঁ। যারা দিন দুনিয়ার কোন খবরই রাখে না তারা বলল, 'মাইকেল আর্দাঁ না কচু; ও নামে কোন লোকই নেই!' কেউ কেউ আবার বলল, 'গোলা ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো লোকটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আর পুড়ে ছাই না হলেও সে এমনিতেই মারা পড়বে–কারণ গোলার ভেতরে তার নিঃশ্বাস নেয়ার মত বাতাস কই? আচ্ছা, না হয় ধরেই নিলাম যেভাবেই হোক লোকটা চাঁদে গিয়ে পৌছল, কিন্তু ফিরবে কেমন করে?' অনেকে আবার বলে বেড়াল–গুলপট্টি আর গাঁজাখুরি গল্পে ফরাসীরা দারুণ ওস্তাদ। চাঁদে মানুষ যাবার ব্যাপারটাও ঠিক এমনি এক গাঁজা।

চারদিকে এতসব কথাবার্তা শুনেও বার্বিকেন কিন্তু টেলিগ্রামটাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলেন না; লিভারপুল জাহাজ অফিসে টেলিগ্রাম করলেন তিনি। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই উত্তর এসে গেল–'এস. এস. আটলান্টা টাম্পার উদ্দেশ্যে লিভারপুল ছেড়েছে। জাহাজের প্যাসেঞ্জার লিস্টে ফরাসী বিজ্ঞানী মাইকেল আর্দাঁর নাম আছে।' খবরটা পাবার পর যে কোম্পানিকে গোলা তৈরির ভার দেয়া হয়েছিল, তাদেরকে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত গোলা তৈরির কাজ বন্ধ রাখতে বলা হল।

এস. এস. আটলান্টা'র প্যাসেঞ্জার লিস্টে মাইকেল আর্দাঁর নাম আছে–এ কথাও কারও জানতে বাকি রইল না। আগে যাদের মনে অবিশ্বাস জন্মেছিল তারাও বিশ্বাস করতে বাধ্য হল, মাইকেল আর্দাঁ নামে সত্যিই কেউ আছেন। তবে কামানের গোলায় ঢুকে তাঁর চাঁদে যাবার কথা কেউই মেনে নিতে পারছিল না। এরপর তারা যখন শুনল, বার্বিকেন আর্দাঁর অনুরোধে গোলা তৈরি বন্ধ রেখেছেন তখন সত্যিই তাদের ভিমরি খাবার জোগাড়। কেউ কেউ আবার ঢালাও মন্তব্য করতে লেগে গেল, 'প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের কারও কারও মাথায় একটু আধটু ছিট থাকে, কিন্তু এ যে দেখছি বদ্ধপাগল; আর বার্বিকেনই বা কম যায় কিসে–শেষকালে এরকম একজন ঠাণ্ডা মাথার লোককেও পাগলামিতে পেয়ে বসল!'

মুখে যে যত কথাই বলুক না কেন, মাইকেল আর্দাঁর জাহাজ কবে টাম্পায় ভিড়ছে তা জানার জন্যে একেকজন অস্থির হয়ে উঠল। এক সাংবাদিক জাহাজ পৌছনর খবরটা কায়দা করে জেনে নিয়ে তার পত্রিকায় ছাপিয়ে দিতেই পত্রিকার কাটতি এক ধাক্কায় বেড়ে গেল কয়েক লাখ।

মাইকেল আর্দাঁর জাহাজ পৌছনর দিন দুয়েক বাকি থাকতেই টাম্পার লোকসংখ্যা চারগুণ বেড়ে গেল। দেখা দিল খাবার দাবার আর পানির সমস্যা। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়েই চলল, তবুও অন্যান্য এলাকা থেকে টাম্পায়

লোক আসা বন্ধ হবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, শান্তিরক্ষী বাহিনীকে নামতে হল শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে।

বিশে অক্টোবর। ভোর বেলা। সূর্য তখনও উঠি উঠি করছে। এমন সময় জেটি থেকে কয়েক মাইল দূরে সমুদ্রের বুকে একটা কালো বিন্দু নজরে পড়ল সবার। বিন্দুটা একটু একটু করে এগিয়ে আসতেই পরিষ্কার বোঝা গেল–ওটা একটা জাহাজ। যাদের কাছে দূরবীন ছিল তারা জাহাজের গায়ে লেখা নামটা দেখতে পেল–এস. এস. আটলান্টা।

জেটিতে ভিড়তেই কয়েকশো নৌকো জাহাজটাকে ঘিরে ধরল। নৌকোগুলো ভাড়া করেছে কৌতূহলী লোকজনেরা। প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে জাহাজে গিয়ে উঠলেন বার্বিকেন। তারপর যাত্রীদের উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন তিনি, 'মঁশিয়ে আর্দাঁ এসেছেন কি?'

যাত্রীদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে বার্বিকেনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমিই মাইকেল আর্দাঁ, আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা নিন, মি. ইম্পে বার্বিকেন।'

মাইকেল আর্দাঁর বয়েস চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করলেও দেখে মনে হয় যেন ত্রিশও পেরোয়নি। মাঝারি দোহারা গড়ন, কিন্তু শরীরটা লোহার মত পেটা। চেহারায় একটা তীক্ষ্ণবুদ্ধির ছাপ লক্ষ করা যায়। জ্বলজ্বলে চোখ দুটো দিয়ে সারাক্ষণই যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। নাকের দু'পাশে হুলো বেড়ালের মত লম্বা ছড়ানো গোঁফ। কাপড়চোপড়ে আগাগোড়াই টিপটপ। এসব শুনে যে কেউই তাঁকে কাটখোট্টা ভাবতে পারে–আসলে আর্দাঁর স্বভাব কিন্তু এর একেবারে উল্টো। হাসি ঠাট্টা আর গালগল্পে তাঁর সাথে পেরে ওঠা কঠিন। মজার মজার কৌতুক আর চুটকি মিশিয়ে যেভাবে তিনি কথা বলেন তাতে কেউই হাসি চেপে রাখতে পারে না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদানের কথা কাররই আর জানতে বাকি নেই। বিভিন্ন শাখায় তাঁর আবিষ্কারের সংখ্যা এত বেশি যে সবগুলো লিখতে গেলে ছোটখাট একটা বই-ই লিখে ফেলতে হবে।

বার্বিকেনের এতদিন একটা সুনাম ছিল, যে-কোন পরিস্থিতিতেই তিনি ধীর স্থির এবং নির্বিকার। কিন্তু মাইকেল আর্দাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটতেই এতদিনের সুনাম আজ হারালেন তিনি। অবাক চোখে কতক্ষণ আর্দাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন তা তিনি নিজেও জানেন না। ডান হাতটা আর্দাঁর হাতের মুঠোয় লুকোচুরি খেলছে, সেদিকেও খেয়াল নেই–যেন দম ফেলতেও ভুলে গেছেন তিনি। আর্দাঁর সম্মোহনী চোখের দিকে চেয়ে একটা কথাই বারে বারে ঘুরপাক খাচ্ছিল তাঁর মনে–'লোকটা কি সত্যিই চাঁদে যেতে চায়, নাকি স্রেফ তামাশা!' চিন্তায় ছেদ পড়ল লোকজনের হৈ-চৈ আর ধাক্কাধাক্কিতে। চোখ কচলে চারদিকে চাইতেই আঁতকে উঠলেন তিনি। এরই মধ্যে অসংখ্য লোক জাহাজের ডেকে উঠে এসেছে। এদের সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে করতে আর্দাঁর অবস্থা রীতিমত কাহিল। শেষমেষ অন্য কোন উপায় দেখতে না পেয়ে বার্বিকেনকে নিয়ে চট্ করে ঢুকে পড়লেন নিজের কেবিনে।

দু'জনে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, কেবিনে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথাই বলতে পারলেন না। খানিকক্ষণ কেটে যাবার পর বার্বিকেনই নীরবতা

ভাঙলেন, 'মঁশিয়ে আর্দাঁ, সত্যিই কি আপনি চাঁদে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।' ছোট করে উত্তর দিলেন আর্দাঁ।

'কিন্তু ভাল করে একবার ভেবে দেখেছেন, আপনার এ উদ্ভট খেয়ালের পরিণতি কত মারাত্মক হতে পারে?'

'উদ্ভটই বলুন আর যা-ই বলুন, আমার কথার একচুলও নড়চড় হবে না।'

'তবুও, ব্যাপারটা মোটেই ছেলেখেলা নয়। তাই বলছিলাম, ঠাণ্ডা মাথায় এ নিয়ে আর একবার ভেবে দেখুন।' মোলায়েম গলায় বললেন বার্বিকেন।

'আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না,' পরিষ্কার বিরক্তি প্রকাশ পেল আর্দাঁর কণ্ঠে, 'এরকম একটা মামুলি ব্যাপার নিয়ে এত ভাবাভাবির কি থাকতে পারে! যখন শুনলাম কামান দেগে চাঁদে গোলা পাঠাচ্ছেন তখনি আইডিয়াটা মাথায় এল—ভাবলাম, এ সুযোগে চাঁদে একটা চক্কর দিয়ে এলে মন্দ হয় না। যাক সে-কথা, গোলাটা নতুন করে তৈরি করছেন তো?'

'হ্যাঁ, আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই কাজটা আপাতত বন্ধ রেখেছি, এবারে নতুন ছাঁচে ফেলে গোলাটাকে তৈরি করতে হবে,' একটু দম নিয়ে বার্বিকেন বললেন, 'মঁশিয়ে আর্দাঁ, বেশ বুঝতে পারছি, কোনকিছুতেই আপনাকে টলানো যাবে না, কিন্তু কোন পরিকল্পনা ছাড়াই এভাবে হুট্ করে চাঁদে যাবার ঝুঁকিটা ঠাণ্ডা মাথায় আর একটিবার ভেবে দেখুন।'

'কোনরকম চিন্তাভাবনা না করেই চাঁদে যেতে চলেছি, এ কথা কে বলল আপনাকে?' বার্বিকেনের কথায় ফুঁসে উঠলেন আর্দাঁ, 'গোটা ব্যাপারটা আগাগোড়াই ভেবে রেখেছি আমি, এবং সেভাবে একটা পরিকল্পনাও খাড়া করেছি—কিন্তু সেসব কথা জনে জনে বলে বেড়াতে পারব না। আপনি বরং আগামীকাল একটা জনসভা ডাকুন। যা কিছু বলার সে সভাতেই আমি বলব।'

এরপরেও দু'জনের মধ্যে আরও অনেক কথা হয়েছিল, কেবিনের দরজায় আড়ি পেতেও কেউই তার একবর্ণও শুনতে পেল না। অনেকক্ষণ পরে আর্দাঁর কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন বার্বিকেন—লোকজন অবাক হয়ে দেখল, চেহারায় দুশ্চিন্তার কোন চিহ্ন তো নেই-ই, বরং খুশিতে ঝলমল করছে তাঁর চোখমুখ।

সেদিন রাতেই ঘোষণা করে দেয়া হল: বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মাইকেল আর্দাঁ আগামীকাল এক বিরাট জনসভায় চাঁদে অভিযানের ওপর এক আশ্চর্য বিবৃতি দেবেন। লোকজনকে দলে দলে যোগ দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

আট

একুশে অক্টোবর। সকালবেলা। জাহাজঘাটের সঙ্গে লাগোয়া বিরাট মাঠটা লোকজনের ভিড়ে প্রায় ভরে এসেছে। টাম্পার টাউন হলে এত লোকের জায়গা হবে না বুঝতে পেরেই মাঠটা ভাড়া নিয়েছিলেন বার্বিকেন। জাহাজ কোম্পানির লোকেরা

গোটা মাঠটাই ত্রিপলের ছাউনি দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল–হাজার অনুরোধ করেও একাজের জন্যে তাদেরকে পয়সা গছানো গেল না।

বেলা বারোটার পরে একচুল জায়গাও আর খালি রইল না। যারা পরে এল তাদেরকে বাধ্য হয়েই মাঠের বাইরে, কাঠফাটা রোদের নিচে জায়গা করে নিতে হল।

ঘড়িতে তিনটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে মাইকেল আর্দাঁকে সাথে নিয়ে মঞ্চে উঠলেন বার্বিকেন। আর্দাঁকে দেখতে পেয়েই লাখ লাখ লোক উল্লাসে ফেটে পড়ল–একটুও বিব্রত না হয়ে তিনিও হাত নেড়ে জনতার প্রাণ-ঢালা শুভেচ্ছার জবাব দিয়ে চললেন।

কয়েক মিনিট পরে, হৈ-চৈ একেবারে থেমে গেলে আর্দাঁ নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধীর অথচ স্পষ্ট গলায় বলতে শুরু করলেন তিনি, 'সমবেত সুধী মণ্ডলী, অনেক কষ্ট স্বীকার করে এ সভায় যোগ দেয়ার জন্যে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আপনারা জানেন, কেন আজ এ সভার আয়োজন। হ্যাঁ, কিভাবে আমি চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাব তা আপনাদের কাছে খোলাসা করে বুঝিয়ে বলার জন্যেই আমাকে আজ এখানে ডাকা হয়েছে। মূল আলোচনায় যাবার আগে অন্যান্য কিছু ব্যাপারে আমি দু'চার কথা বলে নিতে চাই।

'জ্ঞানী গুণী লোকেরা বলে থাকেন, এ শতাব্দীর বিজ্ঞান মানেই হচ্ছে এগিয়ে চলা; আর এগিয়ে চলাকেই আমরা বলে থাকি প্রগতি। মানুষ তার আদিম জীবন ব্যবস্থা থেকে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তবেই আজকের এ বৈজ্ঞানিক যুগে আসতে পেরেছে। একেবারে গোড়ার কথা ভেবে দেখুন, সে-সময়ে হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার মত শক্তিও মানুষের ছিল না–আর আজ? মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যে সে-সব জন্তুকে খাঁচায় পুরে রাখা হয়, দেখানো হয় সার্কাস। কোন কোনটিকে আবার নাকে দড়ি দিয়ে ফসল ফলানো এবং গাড়ি টানার কাজে লাগানো হয়। এসব কথায় শুধু একটা বিষয়ই খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়–মানুষের ক্ষমতার কোন সীমা নেই। যে-সমস্ত জীব জানোয়ারের ভয়ে সে সবসময়েই তটস্থ থাকত আজ সেগুলোকে সে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে! এ তো গেল জীবজন্তুর কথা। মানুষ প্রকৃতিকেও কি অদ্ভুত কৌশলে হাতের মুঠোয় এনেছে, ভাবতেও অবাক লাগে। এ নিয়ে বেশিকথা বলতে গেলে আলোচনা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আমি শুধুমাত্র যানবাহনের উন্নতি নিয়ে কয়েকটা কথা বলব। একেবারে আদিম যুগে কোন যানবাহন ছিল না; তখনকার দিনে একমাত্র অবলম্বন ছিল পায়ে হাঁটা। এরপরে জীবজন্তুর পিঠে চড়তে শিখে গেল মানুষ। আরও পরে চাকাওয়ালা গাড়ি জুড়ে দেয়া হল এদের সঙ্গে। এর অনেক অনেক শতাব্দী পরে এল মোটর গাড়ি এবং রেল। এবারে তাকানো যাক জলপথের দিকে। আগে কি ছিল? এর ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে পালের নৌকো ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর অনেক পরে এল পালতোলা জাহাজ; অনেক আবর্তন বিবর্তনের পরে সবশেষে এল কয়লা, বাষ্প কিংবা অন্য কোন শক্তিতে চালানো যায়, এমন জাহাজ।

'এতক্ষণ আমি যা বললাম তা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, সেটা হল–জল এবং স্থল আজ মানুষের হাতের মুঠোয়, দুটোতেই তার অবাধ

চলাচল। কিন্তু আজ অবধি মানুষ আকাশকে জয় করতে পারেনি। তাই বলে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, আকাশ চিরকালই অজেয় থাকবে। আমি তো দিব্য চোখে দেখতেই পাচ্ছি, আমাদের ভাবী বংশধরেরা কামানের গোলায় চেপে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াত করছে। এতে সময় ও পরিশ্রম দুই-ই বেঁচে যাবে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন–এত প্রচণ্ড গতির গোলায় চেপে চলাচল করা কি বাস্তবে সম্ভব? এর উত্তরে আমি বলব একশোবার সম্ভব। গতি নামের শক্তিটি একেবারেই আপেক্ষিক। আমাদের এই পৃথিবীর কথাই ধরা যাক না; যার গতি ঘণ্টায় ত্রিশ হাজার মাইল। কিন্তু কই, আমরা তো এর প্রচণ্ড গতির তোড়ে ভেসে যাচ্ছি না! সুতরাং গতি কোন সমস্যাই নয়–সমস্যা হল একে নিয়ন্ত্রণে রাখা। কারও কারও কাছে আজগুবি শোনালেও একটা কথা আমি জোর দিয়েই বলতে চাই–সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন কামানের গোলায় চেপে হাওয়া বদলাতে মানুষ পাড়ি জমাবে চাঁদের দেশে কিংবা অন্য কোন গ্রহে। একথা শুনে অনেকেই দূরত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলবেন। আসলে দূরত্ব কোন সমস্যাই নয়। পৃথিবীটাকে যে তিনবার চক্কর মেরে আসতে পারে, চাঁদে যাওয়া তার কাছে স্রেফ ছেলেখেলা। কারণ আপনারা অনেকেই জানেন চাঁদের দূরত্ব পৃথিবীর পরিধির তিনগুণ। পৃথিবীকে তিনবার ঘুরে আসতে হলে আপনাকে অসংখ্য খানা খন্দক, নদীনালা আর ঝোপ জঙ্গল পার হতে হবে। কিন্তু চাঁদে যাবার বেলায় সে সমস্ত ঝামেলা নেই; আর সময়ও লাগছে কম–মাত্র সাতানব্বই ঘণ্টা।'

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন আর্দাঁ। দম নেয়ার জন্যে কয়েক মুহূর্ত থামতেই বার্বিকেন জিজ্ঞেস করলেন, 'চাঁদে কিংবা অন্য কোন গ্রহে কি প্রাণী আছে?'

'গান ক্লাবের মাননীয় প্রেসিডেন্ট জানতে চাইছেন,' লম্বা দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন আর্দাঁ, 'চাঁদ কিংবা অন্যান্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা। এর উত্তরে আমি শুধু এটুকুই বলব–চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহেও জীবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। আমাদের পৃথিবীও সৌরমণ্ডলের একটা গ্রহ। এর বুকে যদি হাজারো জীবজন্তু চরে বেড়াতে পারে তাহলে অন্য গ্রহগুলোতেই বা কেন দু'চারটে প্রাণী থাকবে না। তবে এ ব্যাপারে আমার মত মূর্খের চূড়ান্ত রায় দেয়া সাজে না। আর সেজন্যেই তো চাঁদে গিয়ে নিজের চোখে সব কিছু পরখ করে দেখতে চাই।'

সভার একজন শ্রোতা এক ফাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'যতদূর জানি, গ্রহ উপগ্রহের প্রত্যেকটিতে হয় খুবই গরম নয়ত ভীষণ ঠাণ্ডা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এরকম চরম আবহাওয়ার মধ্যেও কি প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব?'

হাতের ইশারায় লোকটাকে বসতে বলে আর্দাঁ বলতে লাগলেন, 'এখানে একজন প্রশ্ন করছেন, গ্রহ উপগ্রহের চরম আবহাওয়ার মধ্যেও প্রাণের কোন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কিনা; কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে আমরা বলতে পারি–ও রকম চরম ঠাণ্ডা কিংবা গরমের মধ্যেও কোন প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব কি না। এর সোজা-সাপ্টা উত্তর না দিয়ে কয়েকটা উদাহরণ টেনে আনতে চাই–মাছ পানিতে যেভাবে বেঁচে থাকে, অন্য কোন ডাঙার প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। এখন মাছকে যদি ডাঙায় তুলে আনা হয়, কিংবা ডাঙার প্রাণীকে যদি পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়

তাহলে যে মারাত্মক কাণ্ড ঘটে যাবে তা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলার কোন প্রয়োজন পড়ে না। জীব বিজ্ঞানীরা এমন কিছু সামুদ্রিক প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন যেগুলো সমুদ্রের একেবারে গভীরে বাস করে; অথচ অন্য কোন সামুদ্রিক প্রাণীকে সেখানে নিয়ে ছেড়ে দিলে পানির প্রচণ্ড চাপে একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। কিছু কিছু জলজ প্রাণী দেখা যায় যেগুলো উত্তপ্ত ঝর্ণা কিংবা প্রস্রবণের পানিতেই থাকতে বেশি পছন্দ করে। আবার এমন প্রাণীও আছে যারা মেরু এলাকার বরফ গলা পানির নিচেই থাকতে ভালবাসে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাণীর বেঁচে থাকার ব্যাপারে পরিবেশ কিংবা আবহাওয়ায় চরম বলে কোন কথা নেই–এখানে সবকিছুই আপেক্ষিক। কোন একটা বিশেষ পরিবেশ কিছু প্রাণীর জন্যে স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হলেও অন্য পরিবেশে বেড়ে ওঠা জীবের জন্যে তা মারাত্মক বিপদ বয়ে আনতে পারে। পানির মাছকে ডাঙায় তুললে ঠিক এরকমটাই আমরা দেখতে পাই।

'এর পরেও যদি কেউ বলতে চান, অন্য গ্রহ-উপগ্রহে জীবজন্তুর বেঁচে থাকার মত পরিবেশ নেই তাহলে একটা কথাই তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই–আমাদের পৃথিবীটাই যে প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্যে আদর্শ জায়গা, এমন কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ কি তিনি হাজির করতে পারেন? কিন্তু এর বিপক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ আমাদের হাতের কাছেই আছে। ঋতুচক্রের কথাই ধরা যাক। কখনও কাঠফাটা গরম, আবার কখনও বা রক্তজমানো ঠাণ্ডা। এসবের কারণেই সর্দি-কাশি এবং ফ্লু'র মত রোগ বালাই আমাদের শরীরে এসে ভর করে। বিভিন্ন ঋতুর মধ্যে এত পার্থক্যের কারণ কি জানেন? আমাদের পৃথিবীটা তার অক্ষরেখার ওপর বেশ খানিকটা বেঁকে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে–আর তাতেই এতসব বিপত্তি! এদিক দিয়ে বৃহস্পতি গ্রহ অনেক শান্তিতে আছে। নিজ অক্ষরেখার ওপর মোটামুটি সোজা হয়েই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে সে; আর সেজন্যেই রোগশোক সেখানে কম, ঘন ঘন দিন রাতের ঝামেলা নেই, ঋতুতে ঋতুতে এত পার্থক্যও দেখা যায় না। যদি সম্ভব হত, তাহলে পৃথিবীটাকেও তার অক্ষরেখার ওপর সোজা করে বসিয়ে দিয়ে, রাজ্যের যত রোগ বালাই সব ঝেঁটিয়ে বিদায় করতাম।'

নয়

আর্দা বোধহয় আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু লাখ লাখ লোকের শ্লোগান আর হাততালির আওয়াজে চাপা পড়ে গেল তাঁর কণ্ঠস্বর। দু'চার মিনিট পরে হৈ-চৈ কিছুটা কমে এলে আবার উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক লাখ লোকের মধ্যে থেকে একজন শ্রোতা উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মঁশিয়ে, অনেক গালগল্পই তো শুনলাম। এবারে আসল কথায় আসুন। আমরা এখানে পৃথিবী কিংবা বৃহস্পতি নিয়ে আলোচনা শুনতে আসিনি–আমরা এসেছি আপনার চাঁদে যাবার পরিকল্পানার কথা শুনতে।'

সভার সবাই তো একেবারে থ'–লোকটা বলে কি, পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীর

মুখের ওপর এতবড় কথা! বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে আর্দাঁ বললেন, 'ঠিক। আমরা চাঁদ নিয়েই কথাবার্তা বলতে এসেছি; এবারে বলুন আপনি কি জানতে চান?'

'একটু আগেই আপনি বলেছেন, চাঁদেও নাকি প্রাণী আছে; যদি তাই হয় তাহলে একথাও মেনে নিতে হয় যে তাদের নিঃশ্বাস নেয়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না–কারণ আমরা জানি চাঁদে বাতাস নেই।'

'আচ্ছা!' বিদ্রূপের সঙ্গে বলে উঠলেন আর্দাঁ, 'তা সেকথা আপনি জানলেন কেমন করে?'

'এ ব্যাপারে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরাই বলেছেন চাঁদে বাতাস নেই!' বেশ তেজের সঙ্গেই উত্তর দিল লোকটা।

'অ।' বিরক্তিতে আর্দাঁর ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল, 'যারা কোন তথ্যকে হাতেকলমে পরখ করে রায় দেন তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা করি; কিন্তু যাঁরা কোনকিছু না জেনেশুনেই নিজের মতামতকে সত্যি বলে জাহির করতে চান তাঁদেরকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। চাঁদে বাতাস নেই একথা আপনি কার কাছে শুনলেন?'

'চাঁদে বাতাস আছে কি নেই এ কথা প্রমাণ করতে বিশেষজ্ঞের মতামত টেনে আনার কোন প্রয়োজন পড়ে না, আমি নিজেই এর অসংখ্য প্রমাণ হাজির করতে পারি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসার সময় বাতাসে বাধা পেয়ে একটু বেঁকে যায়; কিন্তু চাঁদের বুকে যখন কোন নক্ষত্রের আলো এসে পড়ে তখন তা একেবারে সরল রেখা বরাবরই আসে–একটুও বেঁকে যায় না; কারণ চাঁদে বাতাস বলে কিছু নেই।'

'বাহ্! আপনি তো দেখি দারুণ এক চন্দ্র বিশারদ!' টিটকারি ছুঁড়ে মারলেন আর্দাঁ, তারপর বললেন, 'এবারে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো; চাঁদে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি আছে একথা আপনি মানেন?'

'অবশ্যই; তবে সেগুলো থেকে লাভা বেরোয় না।'

'কিন্তু কোন এক সময় সেগুলোর মুখ দিয়ে লাভা বের হত–একথা স্বীকার করেন?'

'করি। কিন্তু সেজন্যে বাতাসের কোন প্রয়োজন ছিল না; আগ্নেয়গিরিতেই পরিমাণ মত অক্সিজেন পাওয়া যেত।' আর্দাঁকে কায়দামত বাগে পেয়ে লোকটার কথা বলার উৎসাহ যেন কয়েকশো গুণ বেড়ে গেল, 'সতেরোশো পনেরো সালে বিজ্ঞানী লুভিলে আর হেলি চাঁদে এক অদ্ভুত ধরনের আলো দেখতে পেয়েছিলেন; কিন্তু আসলে তা ছিল উল্কার আলো–এ কথা তাঁরা পরে স্বীকার করেছিলেন।'

'বাদ দিন ও কথা। সতেরোশো একাশি সালে হার্সেলও চাঁদে আলো দেখতে পেয়েছিলেন, তা নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার?'

'কিন্তু হার্সেল নিজেই তো বুঝতে পারেননি যে, সে আলো চাঁদের নাকি অন্য কিছুর।' আর্দাঁকে এবার রীতিমত কোণঠাসা করে ফেলল লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড চুপ থাকার পরে আবার মুখ খুলল সে, 'মুসেঁবিয়র কিংবা মদলারের মত বাঘা বাঘা পণ্ডিতেরাও মেনে নিয়েছেন, চাঁদে বাতাস নেই।'

চিন্তার রেখা ফুটে উঠল আর্দাঁর কপালে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছলেন তিনি। তারপর বললেন, 'বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্বিদ মঁশিয়ে

লসেদতের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন, এবং চাঁদ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদও আপনার অজানা থাকার কথা নয়।'

'অবশ্যই; মঁশিয়ে লসেদতের নাম কে না জানে! চাঁদ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদের কথাও আমার জানা নেই।'

'সত্যিই?' আগের মেজাজ ফিরে এল আর্দাঁর কণ্ঠে, 'কিন্তু তিনি ভুলেও কোনদিন বলেননি যে চাঁদে বাতাস নেই; বরং বরাবরই তাঁর ধারণা, হালকা হলেও চাঁদের একটা বায়ুমণ্ডল আছে।'

'যদিও বাতাস থেকে থাকে তবে তা এতই হালকা যে মানুষের শ্বাস নেয়ার জন্যে মোটেই উপযোগী নয়।'

'যত হালকাই হোক না কেন, একজনের জন্যে তা-ই যথেষ্ট। তাছাড়া চাঁদে পৌঁছেই আমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে অক্সিজেন তৈরির কাজে লেগে যাব; এ কাজের জন্যে যে ক'দিন সময় লাগবে সে ক'দিন একটু কম করেই না হয় শ্বাস নেব!' আর্দাঁর একথা শুনে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল শ্রোতাদের। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে আবার বলতে শুরু করলেন তিনি, 'চাঁদে বাতাস আছে, এ কথা যখন মেনে নিয়েছেন, তাহলে এ-ও আপনাকে মেনে নিতে হবে যে, সেখানে পানিও আছে। কারণ পানি না থাকলে বাতাস থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না।' আর্দাঁর অকাট্য যুক্তির কাছে লোকটাকে নাস্তানাবুদ হতে দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ল সবাই।

হৈ-চৈ কিছুটা কমে এলে আবার বলতে শুরু করল লোকটা, 'বেশ। আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। এবারে অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক–যে গোলাটায় চেপে চাঁদে যেতে চাইছেন সেটা তো বায়ুমণ্ডল ভেদ করে বেরিয়ে যাবার সময়েই...'

'ব্যস, আর বলতে হবে না,' কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন আর্দাঁ, 'আপনি বলতে চাচ্ছেন মাধ্যাকর্ষণ পেরিয়ে যাবার সময় বায়ুস্তরের সঙ্গে ঘষাঘষিতে গোলাটা ভীষণ ভাবে তেতে উঠবে, আর তাতেই আমি ঝলসে রোস্ট হয়ে যাব, তাই না? যদি এরকম কিছু ভেবে থাকেন তাহলে খুবই ভুল করেছেন। কারণ গোলাটাকে এজন্যেই যথেষ্ট পুরু করে বানানো হচ্ছে। এছাড়া মাধ্যাকর্ষণ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। ওইটুকু সময়ের মধ্যে আর যা কিছুই হোক না কেন, মরে ভূত হব না নিশ্চয়ই।'

'তা না হয় বুঝলাম কিন্তু চাঁদে গিয়ে খাবেন কি? শুধু হাওয়া খেয়ে তো আর পেট ভরবে না!'

'কেন? বছর খানেকের খাবার দাবার তো সঙ্গে করেই নিয়ে যাচ্ছি; সেগুলো ফুরিয়ে যাবার আগেই জমিতে বীজ বুনে দেব; তাহলেই এ নিয়ে আর কোন সমস্যা হবার কথা নয়।'

'এবারে বলুন দেখি, এতটা লম্বা পথ পাড়ি দেয়ার মত বাতাস কোথায় পাবেন? গোলাটার চারদিকই তো বন্ধ থাকছে। সুতরাং বাইরে থেকে বাতাস ঢোকার পথও তো বন্ধ।'

'এটা কোন সমস্যাই নয়; বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাতাস তৈরি করার জন্যে যা কিছু দরকার সবই তো সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

'চাঁদে যদিওবা গোলাটা গিয়ে পৌঁছায়–অবশ্য আদৌ তা পৌঁছবে কিনা এ

ব্যাপারে ঢের সন্দেহ আছে আমার–তাহলে তা ভিষণ বেগে আছড়ে পড়বে।'

'তা ঠিক। কিন্তু চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর চাইতে অনেক দুর্বল, আর সেজন্যেই গোলাটা পৃথিবীতে পড়লে যতটা আঘাত পেতাম তার চাইতে অন্তত ছ'গুণ কম আঘাত পাব যদি তা চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ে।'

'ওই ছ'গুণ কম আঘাতই আপনাকে পাউডার বানিয়ে ফেলার জন্যে যথেষ্ট।'

'মোটেই যথেষ্ট নয়। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি কতগুলি জোরাল হাউই। উল্টোদিকে সেগুলো সময় মত ছুঁড়ে দিয়ে গোলার বেগ কমিয়ে আনব, এবং এরপরেও যে আঘাতটুকু লাগবে তাতে আর যা-ই হই না কেন–পাউডার হব না।

আর্দাঁর এ উত্তরের জন্যে লোকটা বোধহয় তৈরি ছিল না। হাউই ছুঁড়ে গতিকে বশে আনা যেতে পারে একথা শুনে একটু যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে। তবুও তার প্রশ্ন শেষ হল না। বলল, 'আচ্ছা, নাহয় ধরেই নিলাম বহাল তবিয়তে আপনি চাঁদে গিয়ে পৌছলেন, কিন্তু তারপর? ফিরে আসবেন কেমন করে?'

লোকটার কথা শুনে হো, হো করে হেসে উঠলেন আর্দাঁ; বললেন, 'আমি যে ফিরে আসব একথা কে বলল আপনাকে? আমি তো কোনদিনই আর ফিরে আসব না। অবশ্য এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই; সবসময়েই আপনাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকবে। বড় বড় পাথরের চাঁই কেটে অক্ষর বানিয়ে সাজিয়ে দেব চাঁদের বুকে–আর এখান থেকে দূরবীন লাগিয়ে আপনারা তা পড়ে নেবেন।'

কারও মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। আর্দাঁর কথা শুনে বিস্ময়ে যেন বোবা হয়ে গিয়েছে সবাই। লোকটা কিন্তু বিন্দুমাত্র দমল না। সে বলল, 'চাঁদে আর যেতে হচ্ছে না আপনাকে! কামান দাগার সময় যে ভীষণ ধাক্কা লাগবে তাতেই একেবারে ছাতু হয়ে যাবেন।'

'এতক্ষণে একটা সত্যিকারের সমস্যার কথা বলেছেন,' আর্দাঁর চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছায়া ফুটে উঠল, 'কিন্তু এ নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে; আমার বন্ধুই এর একটা উপায় বাৎলে দেবেন।'

'বাহ; চমৎকার। নিশ্চয়ই জাদু জানেন তিনি! তা না হলে এতবড় কামানের ধাক্কাকে বশে আনা চাট্টিখানি কথা নয়; দয়া করে বলবেন, আপনার বন্ধুটির নাম কি?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠল লোকটা।

'তিনি গান ক্লাবের নামজাদা প্রেসিডেন্ট, মি. ইম্পে বার্বিকেন।'

'আচ্ছা! তাইত বলি, কার মাথায় এত বুদ্ধি! সেই আহাম্মকটার কথায় নেচেই তো গোটা দুনিয়াটা এবার জাহান্নামে যেতে বসেছে।'

আর্দাঁর সঙ্গে যখন কথা কাটাকাটি হচ্ছিল তখন থেকেই বার্বিকেন ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিলেন; লোকটার একথা শুনে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন তিনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে যেই তাকে ধরতে যাবেন অমনি গোটা মঞ্চটা যেন হাওয়ায় ভর করে উড়ে চলল।

উৎসাহী শ্রোতারা কাঠের মঞ্চটাকে প্রথমে কাঁধে তুলে নিল; তারপর হৈ-হৈ করতে করতে ছুটল জাহাজঘাটের দিকে।

ভক্তের দল মঞ্চটা মাটিতে নামিয়ে দিতেই বার্বিকেন দেখলেন–একটু দূরেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে গম্ভীর গলায় পেছন থেকে হেঁকে

উঠলেন তিনি, 'এই যে, এদিকে একটু শুনুন তো?'

চমকে পেছন ফিরে চাইল লোকটা। বার্বিকেনকে দেখতে পেয়ে বিন্দুমাত্র ভয় পেয়েছে বলে মনে হল না। বলল, 'আমাকে কিছু বলছেন?'

'আপনার নামটা কি জানতে পারি?' বার্বিকেন জিজ্ঞেস করলেন।

'সবাই আমাকে ক্যাপ্টেন নিকল নামেই চেনে,' জবাব এল।

দশ

'ক্যাপ্টেন নিকল?' বার্বিকেন নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

'হ্যাঁ। আপনার সৃষ্টিছাড়া পাগলামির কথা জানিয়ে দেয়ার জন্যেই আজ আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।' গম্ভীর গলায় বললেন নিকল।

'আজ এতগুলো লোকের সামনে আপনি আমাকে দারুণ অপমান করেছেন; আমিও এর বদলা না নিয়ে ছাড়ব না।'

'বেশ, আমি তৈরি। ডুয়েল লড়তে আপত্তি না থাকলে এখনি এর একটা মীমাংসা হয়ে যাক।'

'না, এখন সময় নেই আমার। এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা জঙ্গল আছে, চেনেন?'

'খুব চিনি।'

'আগামীকাল ভোর পাঁচটায় ওই জঙ্গলেই আমাদের মোলাকাত হবে; রাজি?'

'হ্যাঁ।'

'সঙ্গে করে বন্দুকটা আনতে কিন্তু ভুলবেন না,' বিদ্রূপের সঙ্গে বলে উঠলেন বার্বিকেন!

'আপনি না ভুললেই হল!' নিকলও সমান তেজে উত্তর দিলেন।

সে রাতে একটুও ঘুম হয়নি বার্বিকেনের। না, ডুয়েল লড়ার কথা ভেবে নয়; কামান দাগার সময় গোলাটায় যে ভীষণ ধাক্কা লাগবে, তাকে কি করে বশে আনা যায়–সেকথা ভেবে।

বাইশে অক্টোবর। ভোরের আলো তখনও ভাল করে ফুটে ওঠেনি। এমন সময় আর্দার শোবার ঘরের দরজায় কে যেন নক করল; কিন্তু ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। এরপর দমাদম কয়েকটা বাড়ি পড়ল দরজার ওপর; তবুও কারও সাড়া শব্দ নেই। অগত্যা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল লোকটা, 'মঁশিয়ে আর্দা, আমি ম্যাস্টন, দয়া করে দরজাটা একটু খুলুন।'

ম্যাস্টনের চিৎকারে শেষমেষ ঘুম ভাঙল আর্দার। চোখ কচলে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন তিনি। 'আরে! মি. ম্যাস্টন যে; এত সকালে কোত্থেকে?' আর্দার কণ্ঠে বিস্ময় ফুটে উঠল।

দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ম্যাস্টন–রীতিমত হাঁপাচ্ছে

সে: দু'চারবার লম্বা দম নেয়ার পরে কিছুটা ধাতস্থ হল সে; তারপর বলল, কাল সভায় যে লোকটা বার্বিকেনকে অপমান করেছিল তার নাম ক্যাপ্টেন নিকল। আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক এদের। কালকের অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে বার্বিকেন তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেছেন। আজ ভোরেই দু'জনের যে-কোন একজনকে প্রাণ হারাতে হবে। যেমন করেই হোক, মঁশিয়ে আর্দাঁ, এ ডুয়েল বন্ধ করতেই হবে; এ মুহূর্তে কিছুতেই আমরা বার্বিকেনকে হারাতে পারি না। ভেবে কোন কূলকিনারাও পাচ্ছি না, কিভাবে এ বিপদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করা যায়। মঁশিয়ে, যে করেই হোক, বার্বিকেনকে বাঁচাতে হলে তাড়াতাড়ি কিছু একটা উপায় বের করুন।'

'আপনাদের দেশে,' ঝটপট কাপড় পরতে পরতে বললেন আর্দাঁ, 'খুনোখুনিটা একেবারেই বিনা কারণে হয়। আচ্ছা, ডুয়েল লড়ার জায়গাটা কোথায়, বলতে পারেন?'

এখান থেকে মাইল তিনেক দূরের একটা জঙ্গলে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সেখানে পৌঁছে গেছেন বার্বিকেন।

'তাহলে তো এক মুহূর্তও আর দেরি করা চলে না; শিগ্‌গির চলুন।' বলে ম্যাস্টনকে সাথে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন আর্দাঁ। তারপর দু'জনেই দৌড়ে চললেন জঙ্গলের দিকে। পাকা রাস্তা ধরে দৌড়ে গেলে সময়ে কুলোবে না ভেবেই মাঠ-ঘাট আর ছোটখাট ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটে চললেন ওঁরা।

জঙ্গলের কাছে পৌঁছে দেখতে পেলেন একজন কাঠুরে একমনে কাঠ কাটছে। এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন আর্দাঁ, 'এই যে, কোন শিকারিকে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখেছ?'

'শিকারি! কই, না তো?' আর্দাঁর দিকে ফিরে বলল সে, 'তবে হ্যাঁ, বন্দুক হাতে একটা লোককে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখেছি; কিন্তু সাজপোশাকে শিকারি বলে মনে হল না।'

'কতক্ষণ আগে?'

'তা প্রায় এক ঘণ্টা তো হবেই।'

'এক ঘণ্টা,' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাস্টন, 'তাহলে তো সবকিছুই এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, কোন বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ শুনেছ তুমি?'

'উঁহুঁ।' বলে মাথা নাড়ল সে।

'ঠিক করে বল; কোন হালকা আওয়াজও কি তুমি শুনতে পাওনি?' এবারে আর্দাঁ জিজ্ঞেস করলেন।

'না, মঁশিয়ে, আমি ঠিক ঠিক ভেবেই বলছি–ভোরবেলায় কেউ গুলি ছুঁড়লে অনেক দূর থেকেও আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।'

'লোকটা গেছে কোনদিকে, বলতে পার?'

'ওইদিকটায়।' বলে জঙ্গলের সবচেয়ে ঘন দিকটা দেখিয়ে আঙুল তুলল কাঠুরে!

'কি ভীষণ জঙ্গলরে বাবা! পা ফেলাই দেখছি মুশকিল!' জঙ্গলে ঢুকতে গিয়ে মন্তব্য করলেন আর্দাঁ।

'শুধু তাই নয়, কোনকালে সূর্যের আলো এখানে ঢুকেছিল বলেও মনে হয় না।'

আর্দাঁর কথায় সায় দিয়ে বলল ম্যাস্টন।

জঙ্গলের একেবারে গভীরে ঢুকলেন আর্দাঁ আর ম্যাস্টন; কিন্তু বার্বিকেনের টিকিটাও কারও নজরে পড়ল না। আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরে কাঁদো কাঁদো গলায় ম্যাস্টন বলল, 'মঁশিয়ে, সর্বনাশ যা হবার তা বোধহয় হয়েই গেছে। বার্বিকেন হয়তবা আর বেঁচে···।'

'না, না, ম্যাস্টন, অমন অলক্ষুণে কথা মুখেও আনবেন না,' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন আর্দাঁ, 'কাঠুরে কি বলেছিল মনে নেই? আর আমরাও তো এ পর্যন্ত কোন গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম না!'

গরু খোঁজার মত বার্বিকেনকে খুঁজতে খুঁজতে দু'জনের অবস্থাই একেবারে কাহিল; এমন সময় হঠাৎ তর্জনী তুলে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাস্টন, 'মঁশিয়ে, ওই দেখুন, দূরে ওই গাছটার নিচে কি যেন একটা নড়ছে।'

'তাই তো! দেখে যেন মনে হচ্ছে ওটা একটা মানুষ! জলদি চলুন,' বলে ম্যাস্টনের হাত ধরে দৌড়ে চললেন আর্দাঁ।

গাছটার কাছাকাছি পৌঁছে দেখা গেল আর্দাঁর ধারণাই ঠিক। একটা লোক কুঁজো হয়ে কি যেন করছে–পেছন থেকে চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না। লোকটার একেবারে কাছাকাছি পৌঁছতেই চাপাস্বরে আর্তনাদ করে উঠল ম্যাস্টন–'এ যে দেখছি ক্যাপ্টেন নিকল!'

নিকল কি করছেন তা দেখার জন্যে দু'জনেরই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ার জোগাড়; কিন্তু ক্যাপ্টেন সাহেবের সেদিকে কোন লক্ষ নেই–তিনি তখন অন্য একটা কাজে ব্যস্ত।

মাকড়সার ফাঁদে আটকা পড়েছে ছোট একটা পাখি–আর তাকেই যত্নের সাথে জাল থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছেন নিকল; পাশেই পড়ে আছে বন্দুকটা। ছাড়া পেয়ে পত্ পত্ করে উঠে গেল পাখিটা, আর সেদিকেই একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তিনি। গোটা ব্যাপারটাই লক্ষ করলেন আর্দাঁ–কিন্তু ভেবেই পেলেন না, যার মন এত কোমল সে আবার খুনোখুনি করে কিভাবে! পেছন থেকে ডেকে উঠলেন তিনি, 'এত সকালে একা একা এখানে কি করছেন, মি. নিকল?'

চমকে পেছন ফিরলেন নিকল। বললেন, 'মঁশিয়ে আর্দাঁ! আমারও তো একই প্রশ্ন, আপনিই বা এত সকালে এখানে কেন?'

'আপনার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। মিছেই খুনোখুনি করে কি লাভ, বলুন? মানুষের জীবনের মূল্য অনেক–অকারণে তা ঝরে যাক এটা কেউ-ই চায় না। তাই বলছিলাম, এ দ্বন্দ্বযুদ্ধে ক্ষান্ত দিন, অকারণে রক্তপাত ঘটিয়ে বীর হওয়া যায় না। আজ এ দ্বন্দ্বযুদ্ধ হলে, হয় আপনি নয়ত বার্বিকেন···।'

'বার্বিকেন, কোথায় সে?' আর্দাঁর কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন নিকল, 'দু'ঘণ্টা ধরে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি তাকে। কোন আমেরিকান ডুয়েল লড়তে এসে এভাবে লেজ গুটিয়ে পালায় তা আমার জানা ছিল না!'

চড়া গলায় প্রতিবাদ করে উঠল ম্যাস্টন, 'বাজে বকবেন না, ক্যাপ্টেন নিকল, অন্ধকার থাকতেই তিনি এ জঙ্গলে এসেছেন।'

'তাই নাকি?' নিকলের কণ্ঠে বিদ্রূপ, 'তাহলে চলুন তাকে খুঁজে বের করে

ঝটপট কাজটা শেষ করে ফেলা যাক।'

'আহা; এত ব্যস্ত হবার কি আছে? বার্বিকেনকে আমরা খুঁজে বের করব ঠিকই, কিন্তু ডুয়েল লড়া আর হচ্ছে না,' আর্দাঁ বললেন।

'ডুয়েল হবেই,' ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন নিকল, 'হয় সে, নয়ত আমি–দু'জনের একজনকে আজ মরতেই হবে।'

ম্যাস্টনের আর সহ্য হল না। বুক চিতিয়ে নিকলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। বলল, 'মি. নিকল, একটা মানুষ মারতে পারলেই তো আপনি খুশি; তাই না? বেশ; আমি তৈরি। বার্বিকেনকে না মেরে আমাকে মারুন।'

ক্যাপ্টেন নিকলকে তখন রক্তের নেশায় পেয়ে বসেছে। মাটি থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে যেই ট্রিগার টিপতে যাবেন অমনি দু'জনের মাঝখানে দেয়াল করে দাঁড়িয়ে গেলেন আর্দাঁ, 'আরে! হচ্ছে কি এসব? খুন জখম ছাড়া আপনারা কি আর কিছুই জানেন না?'

দু'জনের কেউই এর কোন জবাব দিল না দেখে আর্দাঁই আবার বললেন, 'ক্যাপ্টেন, একটু পরে আপনাকে এমন একটা প্রস্তাব দেব যা শুনলে খুশিতে আপনার ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করবে।'

'সত্যিই?' সন্দেহ প্রকাশ পেল নিকলের কণ্ঠে।

'সত্যি কি মিথ্যা তা একটু পরেই জানতে পারবেন। এখন চলুন, আগে বার্বিকেনকে খুঁজে বের করা যাক।'

বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না। কাঁচা রোদের আলোয় দেখা গেল–খানিকটা দূরে, বড় একটা গাছের নিচে বসে রয়েছেন বার্বিকেন; নড়ন চড়ন নেই, দেখে মনে হয় গভীরভাবে কিছু একটা ভাবছেন তিনি। কাছে গিয়ে ডেকে উঠলেন আর্দাঁ, 'মি. বার্বিকেন!' কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

একেবারে কাছে এগিয়ে এলেন আর্দাঁ। দেখলেন, মাটির ওপর যত রাজ্যের জ্যামিতিক আঁক-জোখ, আর সেদিকেই একদৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন ভাবছেন বার্বিকেন–পাশেই তাঁর বন্দুকটা ধুলোবালিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এবারে তাঁর কাঁধে হাত রেখে ডেকে উঠলেন আর্দাঁ, 'মি. বার্বিকেন, একা একা এখানে কি করছেন আপনি?'

চমকে পেছন ফিরে চাইলেন বার্বিকেন। তারপর বললেন, 'আরে, মঁশিয়ে আর্দাঁ! আপনি এখানে কোত্থেকে? যাক, দেখা হয়ে ভালই হল; আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছি।'

'সমস্যা! আমার আবার সমস্যা কিসের?' একটু যেন অবাকই হলেন আর্দাঁ।

'কেন? কামান দাগার সময় গোলার গায়ে যে ধাক্কাটা লাগবে সে-কথা মনে নেই?'

'ওহ হো! কথাটা একদম ভুলেই বসেছিলাম। তা, কি করে এর সুরাহা করলেন শুনি?'

'ব্যাপারটা খুবই সহজ–কিন্তু একটু আগে পর্যন্তও তা আমার মাথায় আসছিল না। ধাক্কা যাতে কম লাগে সেজন্যে স্প্রিংয়ের বদলে পানি ব্যবহার করব। গোলার প্রায় অর্ধেকটা পানি দিয়ে ভরে তাতে কিছুটা ফাঁক ফাঁক করে কয়েকটা কাঠের

পাটাতন বসিয়ে নিলেই হল। সবচাইতে ওপরেরটায় থাকবে আপনার আসন আর···।'

বার্বিকেনকে পুরো কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আর্দাঁ বললেন, 'ওসব কথা এখন থাক। তারচেয়ে চলুন একজন নতুন বন্ধুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই।'

'এমন গভীর জঙ্গলে আবার নতুন বন্ধু জোটালেন কিভাবে?'

'সেটা নিজের চোখেই দেখতে পাবেন,' বলে বার্বিকেনকে একরকম টেনে নিয়ে চললেন আর্দাঁ। একটু দূরেই ক্যাপ্টেন নিকল দাঁড়িয়ে–মুখটা অন্যদিকে ফেরানো।

আরও কয়েক পা এগিয়ে যেতেই নিকলকে দেখতে পেলেন বার্বিকেন। লজ্জায় চোখমুখ লাল হয়ে উঠল তাঁর। আর্দাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'ছিঃ, সামান্য একটা ডুয়েল লড়ার কথাও মনে রাখতে পারলাম না! এরচেয়ে মরে যাওয়াও বোধহয় ঢের ভাল ছিল।'

নিকল এগিয়ে আসতেই আমতা আমতা করে বার্বিকেন বললেন, 'সময়মত আসতে না পারায় আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, মি. নিকল। চাঁদ নিয়ে ভাবতে ভাবতে ডুয়েল লড়ার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে বোঝাপড়াটা এখনই হয়ে যাক।' বন্দুকটা তুলে নিলেন বার্বিকেন।

দেখাদেখি নিকলও তাঁর বন্দুকটার দিকে যেই হাত বাড়াতে যাবেন অমনি তেড়ে এলেন আর্দাঁ, বললেন, 'আচ্ছা, খুনোখুনি ছাড়া আর কিছুই কি আপনাদের জানা নেই? ভাবতেও অবাক লাগে, একটা সভ্য দেশের নাগরিক হয়েও অকারণে হাতে বন্দুক নিয়ে অবাধে আপনারা ঘুরে বেড়ান। আপনাদেরকে বীর বলতেও আমার বাধে; বীরের জাত কখনও যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া রক্ত দেখতে ভালবাসে না।'

ধমক খেয়ে বার্বিকেন আর নিকল দু'জনেই একেবারে চুপ। আর্দাঁ বলে চললেন, 'আপনারা দু'জনেই একে অন্যকে ভুল বুঝেছেন। নিকল, আপনি ভাবছেন গোলাটা চাঁদের ধারেকাছেও যেতে পারবে না; আর বার্বিকেন, আপনার ধারণা ওটা চাঁদে গিয়ে পৌঁছবেই–কি, ঠিক বলিনি?'

'ঠিক!' একসঙ্গে দু'জন বলে উঠলেন।

'গোলাটা চাঁদে পৌঁছবেই,' বার্বিকেন বললেন।

'মোটেও না। ওটা মাইল দশেকও যেতে পারবে কিনা সন্দেহ!' পাল্টা জবাব দিলেন নিকল।

'থাক; তর্ক করে আর কাজ নেই, ঝগড়াটা আবার বেধে যায় এই ভয়ে দু'জনকে থামিয়ে দিয়ে আর্দাঁ বললেন, 'আপনাদের দু'জনকেই এখন এমন একটা প্রস্তাব দেব যা শুনলে খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করবে।'

'সেই ভোরবেলা থেকে একই কথা শুনে আসছি–প্রস্তাবটা কি, খুলে বলবেন তো?' ঝাঁঝের সঙ্গে জানতে চাইলেন নিকল।

'আপনারা দু'জনেই এ অভিযানে আমার সঙ্গী হোন। গোলাটা সত্যিই চাঁদে পৌঁছায় কিনা তা নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। কি, রাজি?'

'একশো বার!' বলে দু'জনেই খুশির চোটে এমন এক লাফ দিলেন যে তা

দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল আর্দাঁর।

বেমাক্কা লাফ দিতে গিয়ে নিকল আর বার্বিকেন দু'জনেই মাটিতে একেবারে চিৎপটাং। অবশ্য একটু পরেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তাঁরা। তারপর একে অন্যের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

ম্যাস্টন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। আর্দাঁ ওদের দু'জনকে প্রস্তাব দিতেই সে-ও চাঁদে যাবার জন্যে বায়না ধরল। কিন্তু কপাল মন্দ ম্যাস্টনের; জায়গা কমের অজুহাতে বার্বিকেন তার আবদার নাকচ করে দিলেন।

এগারো

বার্বিকেন আর নিকলের মধ্যে বন্ধুত্ব করিয়ে দেয়ার পুরো বাহাদুরিটাই যে আর্দাঁর–একথা জানতে কারও বাকি রইল না। বার্বিকেনকে বাদ দিয়ে লোকেরা এবার মেতে উঠল আর্দাঁকে নিয়ে।

প্রতিদিন শ'খানেক টেলিগ্রাম আর কয়েকশো করে চিঠি এসে জমা হতে লাগল আর্দাঁর ঠিকানায়; এর মধ্যে বেশিরভাগই অভিনন্দন জানিয়ে লেখা। কেউ কেউ আবার চাঁদে যাবার বায়না ধরে চিঠি লিখল। শেষে অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে, টেলিগ্রাম আর চিঠির ছোটখাট একটা পাহাড় গজিয়ে উঠল তাঁর রুমে।

আর্দাঁ কিন্তু একটাও চিঠি কিংবা টেলিগ্রামের জবাব না দিয়ে চুপ মেরে গেলেন; কিন্তু ভক্তের দল নাছোড়বান্দা। দলে দলে তারা টাম্পায় এসে হাজির হল–আর্দাঁকে সবাই এক নজর দেখতে চায়। এ সুযোগে অনেকেই চাঁদে যাবার জন্যে নতুন করে আবদার ধরল। তাদের কেউ কেউ বলল, 'মঁশিয়ে, আমরা চাঁদের দেশের মানুষ। দয়া করে আমাদেরকে জন্মভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।'

রসিকতায় আর্দাঁও কম যান না। তিনি বললেন, 'গোলায় এবারে জায়গা কম, তাই কাউকেই সঙ্গে নেয়া যাচ্ছে না; কিন্তু কথা দিচ্ছি, চাঁদে পৌঁছে আপনাদের চোদ্দ গুষ্টির খবরাখবর নিয়ে তবেই ফিরে আসব পৃথিবীতে।'

যুবতী থেকে শুরু করে মাঝ বয়েসী মহিলারাও আদাজল খেয়ে লেগে গেল–সবাই আর্দাঁর বউ হতে চায়। ভাবখানা এই, একবার বিয়ে করা বউ হতে পারলেই ব্যস; চাঁদে যাওয়া আর ঠেকায় কে! অবস্থা বেগতিক দেখে কয়েকদিনের জন্যে গা ঢাকা দিয়ে বাঁচলেন তিনি।

অন্যদিকে বার্বিকেন কেবল কাজ নিয়েই মেতে রইলেন। এতকিছুর পরেও কামান দাগা নিয়ে খুঁতখুঁতে ভাবটা মন থেকে তাঁর একেবারে দূর হল না। গোলার ভেতরকার পানি সত্যি সত্যিই স্প্রিংয়ের কাজ করবে কিনা, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যে ছোটখাট একটা মহড়ার আয়োজন করলেন তিনি। এ কাজের জন্যে ছোট একটা কামান আর মানানসই সাইজের ফাঁপা একটা গোলা তৈরি করা হল। ভেতরের আসন এবং অন্যান্য সমস্ত কিছুই তৈরি হল বড় গোলাটার অনুকরণে।

একটা হুলো বেড়াল আর কাঠবেড়ালীর বাচ্চাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গোলার

খুদে দরজাটা বন্ধ করে দেয়া হল। তারপর প্রায় দেড়শো পাউন্ড বারুদ ঠেসে দাগা হল কামান।

গোলাটা কয়েক হাজার ফুট ওপরে উঠে ধীরে ধীরে বাঁক নিয়ে আছড়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে। যাতে ডুবে না যায় সেজন্যে আগে থেকেই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল–গোলাটা পানিতে পড়তেই পেছনে পেছনে ছুটে গেল একটা উদ্ধারকারী জাহাজ।

গোলাটাকে জাহাজের ডেকে উঠিয়ে ছোট্ট দরজাটা খুলে দিতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল হুলো বেড়ালটা–চেহারা দেখে মনে হয়, কামান দাগার সময় খুব সামান্যই চোট পেয়েছে সে। কিন্তু কাঠবেড়ালীর বাচ্চাটা গেল কোথায়! কয়েকজন গোলার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে খোঁজাখুঁজি করল–কিন্তু না; যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সেটা। এ রহস্য বেশিক্ষণ রইল না। হুলোটাকে ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে অবাক হয়ে সবাই লক্ষ করল–পেটটা তার বেজায় রকম ফুলে রয়েছে!

যে কোম্পানি গোলা তৈরির ভার নিয়েছিল তারা ১০ নভেম্বর ইস্টার্ন রেলওয়ের বিরাট মালগাড়িতে করে গোলাটা স্টোনহিলে পৌঁছে দিয়ে গেল। খবরটা পরদিন পত্রিকায় বেরোতেই বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজার হাজার লোক ছুটল স্টোনহিলের দিকে।

লোকের ভিড় হবে বুঝতে পেরে গোলাটাকে বড় একটা মাঠে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু লোকের ভিড়ে বিরাট মাঠটাও এক সময় কানায় কানায় ভরে গেল–লোকজনের হৈ-চৈ আর হট্টগোলে যেন টেকাই দায়!

আর্দাঁ গোলাটাকে দেখে মনে মনে খুশি হলেন ঠিকই, কিন্তু মুখে বললেন, 'এটা কি বানিয়েছেন, বার্বিকেন? এরকম কিম্ভূতকিমাকার গোলায় চেপে চাঁদে পৌঁছলে সেখানকার লোকেরা কিন্তু হেসেই গড়াগাড় যাবে।'

আর্দাঁর কথায় হেসে ফেললেন বার্বিকেন। বললেন, 'বাইরের চেহারায় কিই বা এসে যায়; ভেতরটা সাজিয়ে নেয়ার ভার রইল আপনার ওপর–এবারে খুশি তো?'

চাঁদে অভিযানের ইতিহাস লেখার সময় কামান এবং গোলারও যুতসই নাম থাকা চাই। তা নাহলে পরবর্তী বংশধরদের কাছে ইতিহাসটা বড় পান্‌সে ঠেকবে। তাই সবাই মিলে গোলার নাম রাখল প্রোজেক্টাইল আর কামানের নাম কলাম্বিয়াড।

কামান দাগার ভীষণ ধাক্কাটা যাতে সামলে ওঠা যায় সেজন্যে গোলার ভেতরে তিন ফুট পানি ঢেলে কয়েকটা কাঠের চাকতি ফাঁক ফাঁক করে বসিয়ে দিয়ে তাতে এমন কৌশলে স্ক্রু লাগানো হল যাতে প্রয়োজনমত খুলে ফেলা যায়। চাকতিগুলো রইল আড়াআড়িভাবে; এতে গোলার পানি কয়েকটা স্তরে ভাগ হয়ে গেল।

সবচাইতে ওপরের চাকতিটায় একসারি মজবুত স্প্রিং জুড়ে দিয়ে বসানো হল যাত্রীদের জন্যে গদি মোড়া চেয়ার। সামনের দিক থেকে আসা ধাক্কা কিংবা ঝাঁকুনিকে ঠেকাবে গদির নিচে রাখা স্প্রিং আর পেছনের ধাক্কাকে সামলাবে কয়েক স্তরে ভাগ করা পানি। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে পানিকে বাইরে বের করে দেয়ার জন্যে রইল প্যাঁচকল লাগানো কয়েকটা নল।

আয়োজনের ঘটা দেখে আর্দাঁ মন্তব্য করলেন, 'এতকিছুর পরেও যদি হাড়গোড় ভাঙে তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের ভেতরকার কলকব্জাগুলোই আসলে লক্কড়মার্কা।'

গোলার দরজাটা দেখতে বড় অদ্ভুত রকমের–দু'মাথা সরু কিন্তু মাঝখানটা চওড়া; জোরে ধাক্কা দিয়েও তা খোলা কিংবা বন্ধ করা যায় না; এর জন্যে রয়েছে বৈদ্যুতিক সুইচ।

যাবার পথে মহাকাশের চোখ জুড়ানো দৃশ্য দেখতে না পেলে অর্ধেক মজাই মাটি। একথা ভেবেই বার্বিকেন চারটে মোটা কাঁচের জানালা লাগানর হুকুম দিলেন। ওপরে নিচে একটা করে আর দু'পাশে দুটো। কামান দাগার সময় কাঁচ যাতে ভেঙে না যায় সেজন্য প্রত্যেকটি জানালার সঙ্গে ইস্পাতের পাত সেঁটে দেয়া হল। প্রয়োজনে খোলা কিংবা বন্ধ করার জন্যে রইল স্ক্রুর ব্যবস্থা।

আলো আর তাপের কোনরকম অভাব যাতে না হয় সেজন্যে বেশি করে গ্যাস নেয়ার ব্যবস্থা করা হল। এজন্যে গোলার ভেতরে ছোটখাট একটা ট্যাঙ্ক বসিয়ে তাতে ঠেসে গ্যাস ঢোকানো হল; ট্যাঙ্কের বাইরে রইল প্যাঁচকলসহ একটা নল।

খাবার দাবার নেয়া হল এক বছরের মত। আর্দাঁর মতে, এসবের নাকি কোন প্রয়োজনই ছিল না। শুধু যাত্রাপথের খোরাকটুকু নিলেই যথেষ্ট; চাঁদে পৌঁছে জমিতে বীজ বুনে দিলেই তো খাবারের সমস্যাটা মিটে যাচ্ছে! তাঁর কথা হল, গোলায় বাড়তি জায়গা থাকলে তা খাদ্যশস্যের মত স্থূল জিনিস দিয়ে না ভরিয়ে শিল্প এবং সাহিত্যের কিছু নমুনা নেয়া হোক। চাঁদের লোকেরা এসব দেখে বুঝবে, পৃথিবীর মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্পকলায় কত উন্নত।

এবারে বাতাস। গোলায় যেটুকু বাতাস থাকবে, কামান দাগার কয়েক ঘণ্টা পরেই তা শেষ হয়ে যাবে। তাই বেঁচে থাকতে হলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাতাস বানিয়ে নিতে হবে। একথা অনেকেই জানে, ২১ ভাগ অক্সিজেন আর ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন একসঙ্গে মেশালে হয় বাতাস। শ্বাস নেয়ার সময় অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের মিক্সচার ফুসফুসে ঢুকে যায়; কিন্তু বেরিয়ে আসার সময় তা পাল্টে হয়ে যায় কার্বন-ডাই অক্সাইড–যা কিনা মানুষের যম। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, বন্ধ গোলায় কেবল ঢালাওভাবে অক্সিজেন তৈরি করলেই চলবে না; ভেতরের বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে যাতে নষ্ট করে ফেলা যায় সে-ব্যবস্থাও রাখতে হবে। এসব কথা ভেবেই বেশি করে পটাশিয়াম ক্লোরেট আর কস্টিক পটাশ নেয়া হল। ৪০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে পটাশিয়াম ক্লোরেট পাল্টে গিয়ে হয়ে যায় ক্লোরাইড অব পটাশিয়াম আর তা থেকে বেরিয়ে আসে অক্সিজেন। একজনের জন্যে ২৪ ঘণ্টায় সাত পাউন্ড অক্সিজেনই যথেষ্ট। গোলার ভেতরকার কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে শুষে নেয়ার জন্যে রইল কস্টিক পটাশ।

বারো

বাতাসের সমস্যাটা মিটে যাওয়ায় সবাই খুশি হলেও ম্যাস্টন কিন্তু বাগড়া দিতে ছাড়ল না। বলল, 'বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা কেবল কাগজে কলমে হলেই চলবে না; গোলার ভেতরে তা কতটুকু কাজ করে সেটা যাত্রার আগেই হাতে কলমে পরখ করে নেয়া উচিত।'

বার্বিকেন ম্যাস্টনের কথায় সায় দিয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ম্যাস্টন ঠিকই বলেছে। পটাশিয়াম ক্লোরেট আর কস্টিক পটাশ গোলার ভেতরে কতটা কাজ করে তা আগে থাকতেই পরীক্ষা করা দরকার; নইলে পরে মারাত্মক বিপদ হতে পারে।'

ঠিক হল, সাত দিনের খাবার-দাবারসহ গোলার ভেতরে কাউকে ঢুকিয়ে দিয়ে এ পরীক্ষাটা করতে হবে। কিন্তু এজন্যে লোক কই? আগে যারা একটু-আধটু আগ্রহ দেখিয়েছিল, সাত দিন বন্ধ গোলায় থাকতে হবে শুনে তারাও পিছিয়ে গেল। শেষমেষ সমস্যার সমাধান করল ম্যাস্টন নিজেই। বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল সে। বলল, 'চাঁদে যাওয়া যখন কপালে নেই তখন পরীক্ষাটা আমার ওপর দিয়েই হোক; এতে দুধের স্বাদ অন্তত ঘোলে মিটবে।'

প্রায় দিন আষ্টেকের খাবার দাবার আর অন্যান্য জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে গোলায় ঢুকে পড়ল ম্যাস্টন; ঢোকার আগে বার্বিকেন ও অন্যান্যদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় সে বলল–গোলার দরজাটা কোন কারণেই যেন সাত দিনের আগে খোলা না হয়।

সাত দিনের দিন সবাই গোলাটার কাছে এসে ভিড় জমাল। দুশ্চিন্তায় একদিন কেউই ভাল করে ঘুমাতে পারেনি। গোলার গা'টা বেজায় পুরু। তাই ভেতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা কারোরই জানার উপায় ছিল না। নির্দিষ্ট সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, বার্বিকেন আর অন্যান্যদের বুকের ধুকপুকানিও ঠিক সেই হারে বেড়ে চলেছে।

সন্ধ্যা ঠিক ছ'টা। সড়াৎ করে খুলে গেল গোলার দরজাটা। ভেতর থেকে হেলতে দুলতে বেরিয়ে এল ম্যাস্টন। সবাই অবাক হয়ে লক্ষ করল, শুকিয়ে যাওয়া দূরে থাকুক–বরং এ কদিনে গা গতরের চেকনাই কিছুটা বেড়েছে তার। বার্বিকেন কিন্তু অত সহজে সবার সঙ্গে একমত হলেন না। তাঁর কথামত একটা ওজন মাপার যন্ত্র আনিয়ে তাতে ম্যাস্টনকে চড়ানো হল–দেখা গেল, আগের চাইতে তার ওজন সত্যিই কয়েক পাউন্ড বেড়ে গেছে।

গান ক্লাবের নামে চাঁদা হিসেবে যে টাকা জমা পড়েছিল তা থেকে বড় একটা অংশ বার্বিকেন আগেই কেমব্রিজ মানমন্দিরের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। চাঁদকে লক্ষ্য করে গোলাটা কেবল ছুঁড়ে দিলেই চলবে না; সেটাকে সবসময় যাতে চোখে চোখে রাখা যায় সেজন্যে চাই শক্তিশালী দূরবীন–আর এ কাজটিরই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাঁদের ওপর। বাজারে যে সমস্ত দূরবীন পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী দূরবীনটি চোখে লাগিয়ে ৩৯ মাইল দূরত্বের মধ্যে চাঁদকে নিয়ে আসা যায়–অর্থাৎ ৩৯ মাইল দূরে থাকলে চাঁদটাকে যত বড় দেখাত, ওই দূরবীন দিয়ে ঠিক ততটা বড় দেখা যায়। কিন্তু হলে কি হবে! পুঁচকে গোলাটা তো আর চাঁদের মত অত বড় নয়। কাজেই কামান দাগার পরে সেটাকে দেখতে হলে আরও শক্তিশালী দূরবীনের প্রয়োজন। সবচাইতে শক্তিশালী যে দূরবীন বাজারে পাওয়া যায় তা দিয়ে কোন জিনিসকে ৬০০০ গুণ বড় দেখা সম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বললেন, গোলাটাকে নজরে আনতে হলে দূরবীনের ক্ষমতাকে আরও ৮ গুণ বাড়াতে হবে–

অর্থাৎ কোন জিনিসকে ৪৮০০০ হাজার গুণ বড় দেখা যায়–এরকম একটা দূরবীন চাই।

তৈরি হল ১৬ ফুট ব্যাসের প্রকাণ্ড একটা আতশ কাচ আর প্রায় ৩০০০ ফুট লম্বা নল। ইঞ্জিনিয়াররা বললেন, যে জায়গায় দূরবীনটা বসানো হবে সেখানে নল এবং কাচ দুটোকেই আলাদাভাবে বয়ে নিয়ে পরে একসঙ্গে জুড়ে দিতে হবে; কারণ আস্ত দূরবীনটা এত ভারি হবে যে, তা বয়ে নেবার সময় যে-কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

অনেক তর্ক বিতর্কের পরে ঠিক হল, দূরবীনটা বসানো হবে রকি পাহাড়ের চুড়োয়। সমভূমি থেকে চুড়োটা প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচুতে। অত ওপরে বসানর পেছনে যুক্তি হল, চাঁদের আলো পৃথিবীতে আসার সময় বায়ুমণ্ডলের ধুলোবালিতে সামান্য বাধা পায়; এজন্যে আলোর দীপ্তিও খানিকটা কমে আসে। সুতরাং যত ওপরে দূরবীনটা বসানো যাবে, আলোও কাঁচটায় এসে পড়তে ততই কম বাধা পাবে।

ঝোপ জঙ্গল, চড়াই উৎরাই আর গভীর খাদ পেরিয়ে পৌঁছতে হয় রকি পাহাড়ের চুড়োয়। এর ওপর আরও রয়েছে হিংস্র জীব জানোয়ার আর জংলীদের হামলা। এরকম বিপদ মাথার ওপরে জেনেও শ্রমিকেরা পিছু হটল না–বুকে সাহস নিয়ে লেগে গেল তারা দূরবীন বসানর কাজে। এতে বেশ কয়েকজন শ্রমিক মারা পড়ল। কেউ পা পিছলে গভীর খাদে পড়ে গিয়ে, আর কেউ বা জংলীদের আক্রমণে।

একটানা কয়েক মাস হাড়ভাঙা খাটুনির পরে দূরবীনটা বসানো হল রকি'র চুড়োয়। আর সেই সঙ্গে নতুন করে শুরু হল ঝামেলা। দূরবীন বসানর খবর পেয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে লোকজন ছুটে এল চাঁদ দেখতে। মানুষের হুড়োহুড়ি আর ধাক্কাধাক্কির চোটে যন্ত্রটাই না আবার ভেঙে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায়–সে ভয়ে সবাই অস্থির। শেষে আর কোন উপায় না দেখে মাথাপিছু চড়া দামের টিকেট ধরা হল; এতে সত্যিই ভিড় কিছুটা কমে গেল।

তেরো

২২ নভেম্বর থেকে শুরু হল বারুদ ঠাসার কাজ। চার লক্ষ পাউন্ড গান কটন বা তুলোর বারুদভরা হবে কামানটায়। টাম্পা থেকে বারুদভর্তি কার্তুজগুলো এজন্যে অল্প অল্প করে স্টোনহিলে আনা হচ্ছিল। ভয় ছিল, কার্তুজগুলো একসঙ্গে সব আনতে গিয়ে না জানি কোন মহাপ্রলয় ঘটে যায়! একটুখানি আগুনের ফুলকি কিংবা সিগারেটের ফেলে দেয়া অংশই এজন্যে যথেষ্ট। তাই মালগাড়িতে করে কয়েক দফায় কার্তুজ আনা হল; আর রেল স্টেশন থেকে কুলিরা সেগুলো খালি পায়ে বয়ে নিয়ে চলল কামানের কাছে। শুকনো গাছপালার সঙ্গে জুতোর ঘষা লেগে সামান্য একটু আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠলেই ব্যস–গোটা পরিকল্পনাটাই চোখের পলকে

লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। বার্বিকেনের তাই কড়া নির্দেশ রয়েছে কুলিরা যাতে খালি পায়ে কাজ করে।

দিনের কড়া রোদে কার্তুজগুলো নাড়াচাড়া করা বিপজ্জনক; তাই কাজ চলল রাতের বেলায়। কামানের ভেতরে এবং বাইরে বিজলী বাতির এমন চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে যে দিনের আলোও তার কাছে হার মেনে যায়।

কার্তুজগুলো ঠিকমত ঢোকাতেই লেগে গেল সাত দিন। স্টোনহিলে এ ক'দিন বাইরের লোকজনের আসা যাওয়া একেবারে বারণ। কিন্তু বারণ করলেই বা শুনছে কে! রাতের ঘুম শিকেয় তুলে বারুদ ভরা দেখতে লেগে গেল অনেকেই। শুধু দাঁড়িয়ে থেকে তামাশা দেখলে ভয়ের কিছু ছিল না, কিন্তু এদের মধ্যে কয়েকজন লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট ফোঁকা ধরতেই ম্যাস্টন গেল খেপে। বাইরের কোন লোককে কামানের কাছে ঘুর ঘুর করতে দেখলেই তেড়ে ওঠে সে। অন্যদিকে, শ্রমিকদের তদারকিতে ছিলেন আর্দাঁ। কার্তুজগুলো বয়ে আনা এবং সেগুলো কামানে ঢোকানর ব্যাপারে খবরদারি করাই ছিল তাঁর কাজ। এ সময় চুরুট না পেলে বিগড়ে যেতেন তিনি। অনেক চেষ্টা করেও ম্যাস্টন তাঁকে বাগে আনতে পারল না। তাঁকে চোখে চোখে রাখার জন্যে শেষমেষ একজন লোক লাগিয়ে দেয়া হল–চুরুটের পোড়া অংশগুলো জড়ো করে বাইরে ফেলে দিয়ে আসে সে।

লম্বা একটা তার সবগুলো কার্তুজের সাথে এমনভাবে পেঁচিয়ে দেয়া হল যাতে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিলেই সেগুলোতে একসঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে। তারের অন্য মাথাটা বাইরে বের করে নিয়ে যাওয়া হল দূরের উঁচু একটা জায়গায়।

এখন বাকি রইল শুধু প্রোজেক্টাইলকে কলাম্বিয়াডের ভেতর নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দেয়া। কিন্তু তার আগে আরও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন দূরবীন, থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, চাঁদের ম্যাপ, রাইফেল এবং প্রচুর বুলেট গোলায় ভরা হল। এছাড়া আরও নেয়া হল শাবল, গাঁইতি, কোদাল আর অন্যান্য দরকারী যন্ত্রপাতি। ঠাণ্ডা কিংবা গরম যাতে কাবু করতে না পারে সেজন্যে রইল দুই আবহাওয়ার উপযোগী কয়েক জোড়া পোশাক। আর্দাঁ অবশ্য এতেও খুশি নন। তাঁর ইচ্ছে; গরু, ঘোড়া, ছাগল এবং অন্যান্য গবাদি পশুও সঙ্গে যাক–পরে চাষাবাদের কাজে লাগবে। কিন্তু জায়গা কমের অজুহাতে বার্বিকেন প্রস্তাবটি নাকচ করে দিলেন। শেষে রফা হল, পশু নেয়া হবে মাত্র দুটো। দুটোই কুকুর। স্যাটেলাইট আর নেপচুন–একটা পুরুষ, অন্যটা মাদি। সবশেষে পৃথিবীর গাছপালার কিছু নমুনা গোলায় তোলা হল। খাবার-দাবার, পানি, ব্র্যান্ডি এসব আগেই নেয়া হয়েছিল। আর্দাঁর মতে, এত বেশি খাদ্যশস্য নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। চাঁদে একবার পৌঁছতে পারলে খাবার দাবারের একটা হিল্লে হবেই। তবুও ম্যাস্টনকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'কামান তো রইলই, যদি সত্যি সত্যিই চাঁদের দেশটা মরুভূমি হয়ে থাকে তো কুছ পরোয়া নেই, মাঝেমধ্যে খাবার ভর্তি দু'চারটা গোলা পাঠিয়ে দিলেই চলবে।'

'অবশ্যই,' সায় দিয়ে বলে উঠল ম্যাস্টন, 'খাবার-দাবার তো হর হামেশাই পাঠাব, এবং ক্রিসমাসে পাবেন কেক আর প্যাকেটে মোড়া উপহার। কিন্তু ওগুলো আপনাদের কাছে ঠিকমত পৌঁছচ্ছে কিনা তা জানব কেমন করে?'

'চাঁদে পৌঁছেই খবর দেয়া নেয়ার একটা উপায় বের করে ফেলব; আর তা যদি করতে না পারি তো বুঝবেন মাথায় আমাদের গোবর ছাড়া কিচ্ছু নেই,' বললেন আর্দাঁ।

প্রয়োজনীয় সবকিছু গোলায় ভরা হয়ে যেতেই বাকি রইল শুধু একটা মাত্র কাজ–প্রোজেক্টাইলকে তুলোর গদির ওপর বসিয়ে দেয়া। জিনিসপত্রের ভারে গোলার ওজন এতই বেড়ে উঠল যে, সবাই রীতিমত চিন্তায় পড়ে গেল; গোলাটা ঢোকানর সময় না জানি কোন্ অঘটন ঘটে যায়!

বিরাট গোলাটাকে খুব সাবধানে কলাম্বিয়াডের মুখের কাছে এনে মজবুত একটা শিকল দিয়ে আটকে দেয়া হল; শিকলের অন্য প্রান্তটি বিশেষভাবে তৈরি একটা কপিকলের সঙ্গে আটকানো। কপিকলের চাকতি উল্টোদিকে ঘোরাতেই গোলাটা উঠে গেল শূন্যে; তারপর সেটা ঝুলতে লাগল কামানটার মুখের ওপর।

এবার আস্তে আস্তে কপিকলের চাকাটা সোজা দিকে ঘুরাতেই গোলাটা ধীরে ধীরে ঢুকে গেল ভেতরে। এ সময় কারও মুখ দিয়েই টুঁ শব্দটি পর্যন্ত বেরোল না–যেন নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গিয়েছে সবাই। কিন্তু না; কোনরকম অঘটন ছাড়াই গোলাটা বসে গেল গান কটনের গদির ওপর। আর সেইসঙ্গে ক্যাপ্টেন নিকল তিন নাম্বার বাজিতেও হেরে গেলেন। পকেট থেকে টাকার বান্ডিল বের করে বার্বিকেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'তিন নাম্বারটাও হেরে গেলাম; এই নিন তার টাকা।'

টাকা সমেত নিকলের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বার্বিকেন বললেন, 'আরে আরে, করছেন কি! আপনি তো এখন আমাদেরই লোক। নিজেদের লোকের কাছ থেকে কি বাজির টাকা নেয়া চলে?'

'খুব চলে। বাজি বাজিই; এতে আবার আপন পর কি? নিন, ধরুন টাকাটা।' বলে একরকম জোর করেই বার্বিকেনকে টাকার বান্ডিলটা গছিয়ে দিলেন নিকল।

এতক্ষণ দুই আমেরিকানের কথা কাটাকাটি শুনছিলেন আর্দাঁ। এবারে বলে উঠলেন তিনি, 'নিকল, মনে আমার একটা কথা বারে বারে উঁকি দিচ্ছে; কথাটা বলব?'

'বলুন না! এরজন্যে আবার এত ভণিতা কিসের?'

'মনে হচ্ছে, বাকি দুটো বাজিতেও আপনি হেরে যাবেন; কাজেই টাকাটা যদি অগ্রিম···।'

'আগে হেরেই নিই, তারপরে দেখা যাবে,' আর্দাঁর কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন নিকল, 'আর সত্যি সত্যিই হারব কিনা, সে-ব্যাপারে এখনও ঢের সন্দেহ রয়েছে আমার।'

চোদ্দ

৩০ নভেম্বর রাত থেকেই ফ্লোরিডাবাসীদের চোখে ঘুম নেই। আর মাত্র হাতে গোনা

কয়েকটি ঘণ্টা। তারপরেই উঁকি দেবে পয়লা ডিসেম্বরের সূর্য; আর জন্ম হবে নতুন এক ইতিহাসের। ওইদিন রাত দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডে কামানের গোলায় চেপে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবে পৃথিবীর মানুষ। একটা বছর ধরে সবার মনে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর জল্পনা-কল্পনা বাসা বেঁধেছিল তার অবসান হবে আরমাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই।

এর কিছুদিন আগে থেকে স্টোনহিলের চারপাশের জংলা জায়গাটায় দলে দলে লোকজন এসে ভিড় জমাচ্ছিল। ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার করে তাঁবু খাটাল ওরা। একটা দুটো করে হাজারটা তাঁবুতে ছেয়ে গেল গোটা এলাকাটা। ছত্রিশ-রাজ্যের ছত্রিশ রকম লোকজনের চেঁচামেচি আর হৈ-হুল্লোড়ে যেন টেকাই দায়! এছাড়া বিদেশ থেকেও এল হাজার হাজার উৎসাহী দর্শক। সব মিলে মনে হচ্ছিল, স্টোনহিলে বুঝি বিশ্বমেলা বসেছে। যেদিকেই তাকানো যাক না কেন, শুধু তাঁবু আর তাঁবু। বার্বিকেন এ তাঁবু–শহরের নাম দিলেন 'সিটি অব মাইকেল আর্দাঁ'।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই খবরের কাগজ বগলদাবা করে দৌড়ে চলল হকাররা। টাম্পা টাউন অবজারভারে খবর বেরিয়েছে: কামানের গোলায় চেপে চাঁদে যাওয়া দেখার জন্যে দেশ-বিদেশের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক ফ্লোরিডায় জড়ো হয়েছে। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আজ রাত দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডের জন্যে।

সকাল থেকেই সিটি অব মাইকেল আর্দাঁর লোকের অন্য সব কাজকর্ম বাদ দিয়ে কামান দাগার আয়োজন দেখতে লেগে গেল। সবাই প্রতীক্ষা করছে সেই বিশেষ মুহূর্তটির জন্যে; উত্তেজনায় নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ভুলে গেছে সবাই। এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, সে-খেয়াল কারও নেই।

বিকেল গড়িয়ে নামল সন্ধ্যা। মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল রূপালী চাঁদ। এর কিছুক্ষণ পরে কামানের কাছে এসে দাঁড়ালেন ওঁরা তিনজন–আর্দাঁ, নিকল আর বার্বিকেন। ওঁদেরকে দেখতে পেয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ল সবাই। লাখ লাখ লোক একসঙ্গে গেয়ে উঠল আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত–ইয়াংকি ডুডল। তিনজনেই মাথা নুইয়ে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করলেন; কিন্তু ওঁদের কারও মাঝে এতটুকু উত্তেজনা প্রকাশ পেল না। জানা না থাকলে কারুর বোঝার সাধ্য নেই যে, আর মাত্র কিছুক্ষণ পরেই চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন ওঁরা। সভ্য আমেরিকান থেকে শুরু করে আদিবাসী পর্যন্ত সবাই ওঁদের ভাবলেশহীন চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। দূরের কোথাও যাত্রা করার সময় লোকজনের মাঝে যেটুকু চাঞ্চল্য দেখা যায়, তার ছিটেফোঁটাও ওঁদের চোখেমুখে প্রকাশ পেল না।

বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে কামানের চারপাশটা ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল, বাইরের লোকজনের সেখানে ঢোকা একেবারে নিষেধ। আর্দাঁ, নিকল আর বার্বিকেন এবারে সেই ঘেরাও করা জায়গাতে পা দিলেন–পেছনে পেছনে এলেন গান ক্লাবের কয়েকজন হোমরাচোমরা সদস্য আর ইউরোপের বড় বড় মানমন্দিরের প্রতিনিধিরা। কামানের একেবারে কাছে এসে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দেখতে লাগলেন সবাই। এতকিছুর মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে চললেন বার্বিকেন। নিকলও চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখছেন, গোটা আয়োজনে কোন

ত্রুটি রইল কিনা। আর্দাঁ এসবের মধ্যে নেই। হাসি ঠাট্টায় তিনি মাতিয়ে রেখেছেন সবাইকে। পরনে তাঁর ভেলভেটের সুট, পায়ে চামড়ার বুট–মুখে জ্বলছে দামী চুরুট।

বিদায়ের মুহূর্ত এসে গেল। এ সময় আর্দাঁর মত ফুর্তিবাজ লোকের চোখেও অশ্রু টলমল করে উঠল; তা দেখে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না ম্যাস্টন–ফুঁপিয়ে উঠল সে। বলল, 'মঁশিয়ে, এখনও সময় আছে। বলুন, কোনমতেই কি আমাকে সঙ্গে নেয়া যায় না?'

'তা হয় না, ম্যাস্টন। তুমি আমাদের সঙ্গে গেলে এদিকটা সামলাবে কে? কামান তো রইলই, আমরা আগে ভালয় ভালয় পৌঁছে নিই, তারপরে তুমি যেয়ো।' আর্দাঁর হয়ে উত্তর দিলেন বার্বিকেন।

ঘড়িতে দশটা বাজতেই গদিমোড়া আসন বসানো কপিকলের সাহায্যে গোলার ভেতরে ঢোকার জন্যে তৈরি হলেন আর্দাঁ, নিকল আর বার্বিকেন। এ সময় লাখ লাখ লোকের চেঁচামেচি আর হৈ-হুল্লোড়ে তিনজনেরই দফারফা হয়ে যাবার জোগাড়! কিন্তু এ অবস্থায় বেশিক্ষণ আর থাকতে হল না ওঁদের। কপিকলের চাকতিটা একটু একটু করে ঘোরাতেই পরিচিত পৃথিবীটা অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। একটু পরেই গদিমোড়া আসনটা গিয়ে ঠেকল গোলার গায়ে। আর দেরি না করে ওঁরা ভেতরে ঢুকে পড়লেন। বৈদ্যুতিক সুইচ টিপতেই গোলার দরজাটা সড়াৎ করে বন্ধ হয়ে গেল।

কামান থেকে অনেক দূরে উঁচু একটা জায়গায় ইঞ্জিনিয়ার মার্চিসন দাঁড়িয়ে; চোখ তাঁর ক্রনোমিটার-ঘড়ির কাঁটার দিকে। একই ঘড়ি রয়েছে বার্বিকেনের হাতেও। মার্চিসনের একটা হাত বৈদ্যুতিক সুইচ স্পর্শ করে রয়েছে; চরম মুহূর্তে সুইচ টিপে দিলেই বৈদ্যুতিক স্পার্ক সবকয়টা কার্তুজে একসঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটাবে।

খানিকক্ষণ আগেও লোকজনের চেঁচামেচিতে গোটা এলাকাটা গম্‌গম্ করছিল; কিন্তু এখন কারও মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটিও বেরোচ্ছে না। রুদ্ধশ্বাসে সবাই শেষ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছে। ঘড়ির দিকে চাইলেন মার্চিসন–রাত দশটা বেজে ছেচল্লিশ মিনিট। টিক্ টিক্ শব্দ করে এগিয়ে যাচ্ছে সেকেন্ডের কাঁটা। দারুণ উত্তেজনায় এই শীতের রাতেও মার্চিসনের সারা শরীর ঘেমে একাকার। সেকেন্ডের কাঁটা তিরিশের ঘর ছুঁল।...পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ–মার্চিসনের হৃৎপিণ্ডটা ভীষণভাবে লাফিয়ে উঠল।... আটত্রিশ, উনচল্লিশ, চল্লিশ। রাত দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড!!!

বৈদ্যুতিক সুইচে চাপ দিলেন মার্চিসন।

যা ঘটল তার বর্ণনা দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। আকাশ ভেঙে লক্ষ লক্ষ বাজ একসাথে পড়লে যে শব্দ হবার কথা, সে-শব্দও যেন এর কাছে কিছু নয়! কায়েকশো ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি একসঙ্গে জেগে উঠলে যে গর্জন শোনা যেত, তা-ও বুঝি হার মেনে যায় কলাম্বিয়াডের প্রলয়ঙ্করী আওয়াজের কাছে। কামানের মুখ দিয়ে লকলকে আগুনের শিখা বের হয়ে আকাশ স্পর্শ করল। টাম্পা ও তার আশেপাশের লোকেরা দেখল, হাজারটা উল্কা যেন আকাশের এক দিক থেকে অন্য দিকে ছুটে যাচ্ছে! রাতের অন্ধকার চিরে আলোর বন্যায় ছেয়ে গেল চারদিক। ভীষণভাবে কেঁপে উঠল ফ্লোরিডার মাটি। লোকজন কে কোথায় ছিটকে পড়ল কে জানে!

এতকিছুর মধ্যেও কয়েকজন দেখতে পেল, কলাম্বিয়াডের মুখ দিয়ে সাঁই করে বেরিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল প্রোজেক্টাইল।

টাম্পা বন্দরের একশো মাইলের ভেতর যে সমস্ত জাহাজ চলাচল করছিল সেসব জাহাজের ক্যাপ্টেনরা আকাশে আগুনের ছোটাছুটি দেখতে পেয়ে হকচকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি লগবুকে তারা লিখে রাখল–আকাশে উল্কার তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছে!

কামান দাগার সঙ্গে সঙ্গে স্টোনহিল ও তার আশেপাশের জায়গা জুড়ে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। তাঁবু শহরের লাখ লাখ লোক দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করল; কিন্তু পালিয়ে যাওয়া কি অতই সহজ? মাটি ভীষণভাবে কেঁপে ওঠায় লোকজন টাল সামলাতে না পেরে একেকজন ছিটকে গিয়ে পড়ল আরেকজনের ওপর। লোকের ঠেলাঠেলির চাপে তক্ষুণি অনেক লোক মারা পড়ল; এছাড়া অসংখ্য লোক আহত কিংবা পঙ্গু হয়ে পড়ে রইল। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর স্টোনহিল মাত্র কয়েক মুহূর্তেই পরিণত হল এক প্রেতপুরীতে।

কামানের বিকট গর্জনে বহু লোক তাদের শ্রবণশক্তি হারাল, স্মৃতিভ্রংশ হল অনেকের। আহতদের মধ্যে ম্যাস্টনও ছিল। কামান দাগার সঙ্গে সঙ্গে সেও ছিটকে পড়েছিল বহুদূরে। সংবিৎ ফিরে পেতেই উঠে দাঁড়াল সে। উঠেই আর্দাঁ, নিকল, বার্বিকেন আর গান ক্লাবের নামে স্লোগান দিতে লাগল। ম্যাস্টনের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আহতদের অনেকেই একসঙ্গে গর্জে উঠল–আর্দাঁ, নিকল, বার্বিকেন জিন্দাবাদ; গান ক্লাব জিন্দাবাদ···।

বৈদ্যুতিক সুইচ টিপে দিতেই গোলার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর্দাঁ দেশলাই জ্বেলে গ্যাস-চুলোর মুখে ধরলেন; দপ্ করে জ্বলে উঠল সেটা–আর সেইসঙ্গে ভেতরকার অন্ধকার এক নিমেষে দূর হয়ে গেল।

নিচে নামতে গিয়েও লোকজনের হৈ-চৈ, চেঁচামেচি কানে আসছিল, কিন্তু এখন বাইরের কোনকিছুই আর শুনতে পাচ্ছেন না ওরা। গোলার ভেতরে রাখা বড় ঘড়িটা একটানা টিক টিক শব্দ করে যাচ্ছে।

বার্বিকেন তাঁর ক্রনোমিটার-ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, 'দশটা বেজে কুড়ি; আর মাত্র ছাব্বিশ মিনিট কুড়ি সেকেন্ড বাকি।'

'মাত্র বলছেন কেন? এ তো যথেষ্ট সময়! রাজনীতি থেকে শুরু করে মানুষের নীতিবোধ পর্যন্ত সবকিছু এ সময়ের মধ্যে আলোচনা করা যেতে পারে···।'

ফুর্তিবাজ আর্দাঁ বোধহয় আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু বার্বিকেন তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'খোশগল্প করার অনেক সময় পাবেন। এখন যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে নিন।'

'আমরা তো তৈরিই। এখন মার্চিসন বাবাজী দয়া করে কামানটা দাগলেই হয়।'

আর্দাঁর কথায় ওঁরা দু'জন হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসির রোল থামলে বার্বিকেন বললেন, 'প্রথম ধাক্কাটা যাতে সামলে ওঠা যায় সেজন্য আমাদের উচিত চেয়ারের হাতল দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে চিৎপাত হয়ে চোখ বুজে থাকা।'

'কিন্তু এর আগে দেখে নেয়া উচিত সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা,' ক্যাপ্টেন

নিকল বললেন।

বার্বিকেন আর আর্দাঁ সবকিছুতে আর একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিলেন। গ্যাসের চুলো, চামড়ার খাপে আটকানো যন্ত্রপাতি, গোলা-বারুদ,খাবার-দাবার এবং পানি–যেখানে যেমনটি থাকা উচিত ছিল, সবকিছু ঠিক তেমনটিই রয়েছে।

'আর মাত্র ৩ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড। যে-যার আসনে গিয়ে বসে পড়ুন।' খানিকটা হুকুমের সুরেই যেন বললেন বার্বিকেন। তারপর উঠে গিয়ে গ্যাসের চুলো নিভিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন নিজের আসনে। গোলার ভেতরে আবার নেমে এল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

এখন কারও মুখ দিয়েই আর কথা বেরোচ্ছে না। প্রচণ্ড উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখার জন্যে চোখ বুজে রয়েছে সবাই। এমন কি আর্দাঁর মত আড্ডাবাজ লোকের মুখেও কোন কথা নেই। শুধু ঘড়ির একটানা টিক টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বার্বিকেন বলে উঠলেন, 'আর মাত্র দশ সেকেন্ড।' রেডিয়াম দেয়া ঘড়ি; তাই অন্ধকারেও সময় দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না।

'ছয় সেকেন্ড।' সবাই একটু নড়েচড়ে বসল।

'তিন সেকেন্ড।' যাত্রীদের শ্বাস-প্রশ্বাসও বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।

'এক সেকেন্ড।' বার্বিকেনের কথা শেষ হল না। আচমকা প্রচণ্ড এক ধাক্কায় চেয়ার থেকে ছিটকে পড়লেন ওঁরা। মাথা ঠুকে গেল গোলার ছাদে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালো সবাই।

বৈদ্যুতিক স্পার্ক দিয়ে চার লাখ পাউন্ড গান-কটনকে একসঙ্গে বিস্ফোরিত করলেন মার্চিসন। চোখের পলকে মহাশূন্যের পথে ধেয়ে চলল প্রোজেক্টাইল।

রকি পাহাড়ের চূড়োয় বসানো বিরাট টেলিস্কোপে চোখ রেখেও কেউ কিছু দেখতে পেল না। পাবে কি করে? গান-কটন পুড়ে যে গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছিল তা যেন সারা আমেরিকার আকাশকেই ঢেকে দিল। সূর্যের মুখ দেখা গেল না বেশ ক'দিন। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন ঝড় শুরু হল। আকাশে জমে থাকা গ্যাসের মেঘ ঝড়ের দাপটে কোথায় মিলিয়ে গেল কে জানে! ওইদিন রাতেই খবর ছড়িয়ে গেল: রকি পাহাড়ের টেলিস্কোপে গোলাটাকে দেখতে পাওয়া গেছে, কিন্তু এখনও সেটা চাঁদে নামতে পারেনি–ডিমের মত কক্ষপথ ধরে চাঁদের চারপাশে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মন্তব্য করেছেন, হয় মাধ্যাকর্ষণের টানে প্রোজেক্টাইল চাঁদে নামবে নয় তো উপগ্রহ হয়ে চাঁদের চারপাশেই অনন্তকাল ঘুরতে থাকবে।

পনেরো

তিনজনের মধ্যে প্রথমে জ্ঞান ফিরে এল আর্দাঁর। হাঁটুতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। গা হাত পা ঝাড়া দিয়ে দেখলেন–না, শরীরের কোথাও মারাত্মক কোন জখম হয়নি। গোলার ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার; নিকল আর বার্বিকেন

কোথায় তা-ও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এবার উঠে গিয়ে গ্যাসচুলো জ্বাললেন তিনি। দপ করে আগুন জ্বলে উঠতেই দেখা গেল–প্রচণ্ড ধাক্কার পরেও গোলার ভেতরকার জিনিসপত্র তেমন লণ্ডভণ্ড হয়নি। গ্যাসের আধার ও খাবার পানির পাত্র অটুট রয়েছে। খাবার-দাবারও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েনি। অস্ত্রশস্ত্র আর দু'চারটে বাসন কোসন কেবল মেঝের ওপর ছিটকে পড়েছে। ওপরেরটা ছাড়া বাকি সবকয়টা কাঠের চাকতি ভেঙে গিয়েছে। চাকতির নিচেকার সমস্ত পানি পাইপ দিয়ে বের হয়ে যাওয়াতে আসন বসানো ওপরের চাকতিটা গিয়ে ঠেকেছিল গোলার একদম নিচে। চাকতির ওপর বার্বিকেন আর নিকল মড়ার মত পড়ে রয়েছেন। আর্দাঁ ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন, 'নিকল, বার্বিকেন।'–কিন্তু ওঁদের কেউ এ ডাকে সাড়া দিলেন না। কি ব্যাপার, মরেটরে গেল না তো?–মনে মনে ভাবলেন আর্দাঁ। তারপর আরও কাছে গিয়ে ওঁদের নাম ধরে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। কিন্তু এবারেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

উঠে গিয়ে পাত্র থেকে খানিকটা পানি নিয়ে এলেন আর্দাঁ। প্রথমে নিকলের চোখেমুখে পানির ঝাপটা দিতেই ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলেন তিনি। ঠোঁট জোড়া নড়ে উঠল তাঁর। অস্ফুট স্বরে তিনি জানতে চাইলেন, 'মঁশিয়ে আর্দাঁ, আমরা সবাই বেঁচে আছি তো, বার্বিকেন কোথায়?'

'তিনি তো আপনার পাশেই শুয়ে আছেন, ভাল করে চেয়ে দেখুন।'

আর্দাঁ এবারে বার্বিকেনের চোখেমুখে পানির ঝাপটা দিতে লেগে গেলেন। নিকল ঘাড় কাত করতেই দেখতে পেলেন, একটু দূরে মড়ার মত পড়ে রয়েছেন বার্বিকেন। চোটটা বোধহয় বেশিই লেগেছিল তাঁর। কাঁধের একদিকে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ।

পানির ঝাপটায় ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল বার্বিকেনের। বেশ কয়েকবার নড়াচড়া করার পর শেষমেষ উঠে বসলেন তিনি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কি চাঁদের দিকে ছুটে চলেছি, নাকি টাম্পার মাটিতেই পড়ে রয়েছি?'

বার্বিকেনের কথায় নিকল আর আর্দাঁ বাস্তবে ফিরে এলেন। সত্যিই তো! এ কথাটা এতক্ষণ কারুরই মনে হয়নি! প্রোজেক্টাইল কি চাঁদের পথে ধেয়ে চলেছে, নাকি কামানের ভেতরেই ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে! জিজ্ঞাসুনেত্রে সবাই একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

হঠাৎ বার্বিকেনের নজর পড়ল গোলার গায়ে লাগানো ব্যারোমিটারের ওপর। পারদ আশির ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'ফ্রেন্ডস, আমরা চাঁদের দিকেই ছুটে চলেছি, ওই দেখুন, তাপমাত্রা কত বেড়ে গেছে।' বলে ব্যারোমিটারের দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। তারপর বললেন, 'বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে আসতে গিয়ে বাতাসের সঙ্গে প্রোজেক্টাইলের ঘষাঘষির জন্যেই এরকমটা হয়েছে। একটু পরেই নেমে আসবে হাড় কাঁপানো শীত।'

'আপনি কি একদম নিশ্চিত যে, আমরা বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে চাঁদের পথে ধেয়ে চলেছি?' আর্দাঁ জিজ্ঞেস করলেন।

'অবশ্যই। ঘড়িতে এখন প্রায় এগারোটা। বাতাসে বাধা পেলেও চল্লিশ মাইল পুরু বায়ুমণ্ডল পেরুতে প্রোজেক্টাইলের মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগা উচিত।'

বার্বিকেনের কথায় লাফিয়ে উঠলেন আর্দাঁ। নিকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ক্যাপ্টেন সাহেব, ভালয় ভালয় টাকাটা বের করুন। দুটো বাজিতেই হেরেছেন আপনি। কামান না ফাটার জন্যে সাড়ে চার হাজার আর দশ মাইলেরও বেশি পথ পেরুনর জন্যে পাঁচ হাজার ডলার···।'

'কিন্তু,' আর্দাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিকল বললেন, 'আমরা যে সত্যি সত্যিই ছুটে চলেছি তার কি কোন প্রমাণ দেখাতে পারেন?'

'আলবত পারি। গোলাটা যদি নাই ছুটবে তাহলে যে যার আসন থেকে ছিটকে পড়লাম কি করে? আর বার্বিকেনের কাঁধেই বা চোট লাগল কেন? এসব কিছু নিশ্চয়ই আপনাআপনি ঘটেনি!'

'তা নাহয় মেনে নিলাম। তবুও গোটা ব্যাপারটার একটা জায়গায় গরমিল কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। যদি সত্যিই কামান দাগা হয়ে থাকে তাহলে সে-শব্দ আমরা শুনতে পেলাম না কেন?'

'গোলার দরজা বন্ধ ছিল, তাই।'

'চার লাখ পাউন্ড গান-কটন বিস্ফোরণের শব্দ চাট্টিখানি কথা নয়! দরজা বন্ধ থাকলেও তা শুনতে পাওয়া যেত।'

'সত্যিই ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম না। অথচ–।' বার্বিকেন পুরো কথাটা শেষ করলেন না। বেশ চিন্তিত মনে হল তাঁকে।

নিজের আসন থেকে উঠে গিয়ে জানালা খোলার কাজে লেগে গেলেন বার্বিকেন। প্রতিটি জানালা ধাতুর পাত দিয়ে মোড়া। স্ক্রু আলগা করতেই একপাশে সরে গেল ধাতব প্লেট–বেরিয়ে এল লেন্সের মত পুরু জানালার কাঁচ। তিনজন তিন জানালার কাঁচে চোখ রেখে বাইরের জগতটাকে দেখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু না। কেবল ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই ওদের চোখে পড়ল না।

কিন্তু একটু পরেই চেঁচিয়ে উঠলেন বার্বিকেন, 'ওই যে; ওই দেখুন কয়েকটা তারা দেখা যাচ্ছে! খেয়াল করে দেখুন, তারাগুলো একদিক থেকে ধীরে ধীরে অন্য দিকে সরে যাচ্ছে।–এর মানে কি?'

'এর মানে, মহাকাশের পথ ধরে উড়ে চলেছি আমরা!' নিকল আর আর্দাঁ একসঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠলেন।

নিকল বার্বিকেনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কংগ্র্যাচুলেশনস! সত্যিই, শেষ পর্যন্ত বাজিতে আপনিই জিতে গেলেন। এই টাকা,' বলে পকেট থেকে সাড়ে ন'হাজার ডলার বের করে বার্বিকেনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। বার্বিকেনও কম যান না। সঙ্গে সঙ্গে একটা রসিদ লিখে তিনি নিকলের হাতে দিলেন।

দুই আমেরিকানের কাণ্ড দেখে আর্দাঁর মত ফুর্তিবাজ লোকেরও চোখ কপালে উঠে গেল। তবুও মন্তব্য করতে ছাড়লেন না তিনি, 'মহাশূন্যের প্রথম লেনদেন হিসেবে ঘটনাটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে–সেই সঙ্গে অমর হয়ে থাকবে আপনাদের নামও।'

'এবার চলুন, চার নাম্বার জানালা দিয়ে চাঁদকে খুঁজে বের করা যাক,' বলে যেই জানালার স্ক্রুতে বার্বিকেন হাত দিয়েছেন ঠিক তখনি অন্য একটা জানালা দিয়ে প্রকাণ্ড

একটা জ্বলজ্বলে চাকতিকে ওদের গোলার দিকেই আসতে দেখা গেল। ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে চাকতিটা।

'এ কি উল্কা, না অন্য কিছু?' আর্দাঁ জিজ্ঞেস করলেন।

বার্বিকেন এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। দুশ্চিন্তায় রীতিমত ঘেমে উঠেছেন তিনি। শুধু যে চাকতিটাই গোলার দিকে এগিয়ে আসছে তা নয়; গোলাটাও প্রচণ্ড গতিতে চাকতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই দুটোর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হবে। মনে মনে প্রমাদ গুণলেন সবাই। মৃত্যু অবধারিত জেনে ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওঁদের চোখমুখ। কাঁপা কাঁপা গলায় বার্বিকেনকে জিজ্ঞেস করলেন নিকল, 'এ বিপদের হাত থেকে বাঁচার কি কোন উপায় নেই?'

'উপায়?' জোর করে হাসতে চেষ্টা করলেন বার্বিকেন, কিন্তু বাকি দু'জনের কাছে তা কান্নার মত মনে হল। 'নিকল, এর হাত থেকে বাঁচার কোন রাস্তাই জানা নেই আমার। এখন সবারই উচিত একমনে ঈশ্বরের নাম জপ করা।'

'হাউই ব্যবহার করে গোলার গতিপথ পাল্টে দেয়া যায় না?' জিজ্ঞেস করলেন আর্দাঁ।

'সেজন্যেও চাই বেশ কিছুটা সময়; কিন্তু হাতে রয়েছে মাত্র কয়েক সেকেন্ড,' বার্বিকেন বললেন।

এতকিছুর মধ্যেও কৌতুকের সুরে বলে উঠলেন আর্দাঁ, 'শুধু শুধু দুঃখ করে কিই বা হবে বলুন! বরং এই ভেবে আমাদের খুশি হওয়া উচিত যে, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যেই নিজেদেরকে আমরা উৎসর্গ করতে চলেছি···।'

আর্দাঁর কথা শেষ হবার আগেই উজ্জ্বল আলোর বন্যায় যেন ভেসে গেল গোলার ভেতরটা–কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরেই অদৃশ্য হল সেই আলো। কেঁপে উঠল প্রোজেক্টাইল; তারপর নিজের পথ ধরে আবার এগিয়ে চলল সামনের দিকে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই উজ্জ্বল চাকতিটা।

'জোর বরাত আমাদের,' বার্বিকেন বললেন, 'চাকতিটার সঙ্গে সংঘর্ষ হতে হতেও হল না; মাত্র অল্প কয়েক গজ দূর দিয়ে চাকতিটা আমাদের পাশ কাটিয়ে গেল।'

'চাকতিটা আসলে কি?' নিকল জিজ্ঞেস করলেন।

'আগে ওটা একটা উল্কাই ছিল, কিন্তু এখন আর উল্কা বলা যায় না–মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীর চারপাশে উপগ্রহ হয়েই এখন ঘুরছে।'

'বলছেন কি! তার মানে নেপচুনের মত পৃথিবীরও দুটো চাঁদ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এই দ্বিতীয় চাঁদটা এতই ছোট যে পৃথিবী থেকে দূরবীন লাগিয়েও তা দেখতে পাওয়া যায় না। আর এর গতিবেগও আমাদের আসল চাঁদের চাইতে অনেক বেশি। এক ফরাসী বিজ্ঞানী অঙ্ক কষে বলেছিলেন, পৃথিবীকে একবার ঘুরে আসতে এই চাঁদের মাত্র সোয়া তিন ঘণ্টা সময় লাগে।'

'কিন্তু অনেক নামকরা বিজ্ঞানী তো এ চাঁদের অস্তিত্ব মেনে নেননি,' এবারে আর্দাঁ বললেন।

'এর একমাত্র কারণ হল, তাঁরা কেউই দূরবীন চোখে লাগিয়েও চাঁদটাকে

দেখতে পাননি।'

'চাঁদের কথা থাক। কামান দাগার শব্দ কেন শুনতে পেলাম না, সেটার একটা সুরাহা করা দরকার,' বলে গ্যাস বাতি নিভিয়ে দিয়ে আর্দাঁ আর বার্বিকেনের পাশে বসে পড়লেন নিকল।

এরই মধ্যে চার নাম্বার জানালার প্লেটটা খুলে ফেলেছিলেন বার্বিকেন। গ্যাস বাতি নিভিয়ে দিতেই রেশমী আলোয় ছেয়ে গেল গোলার ভেতরটা। বায়ুমণ্ডলের বাধা নেই; নেই কোন ময়লা কিংবা ধুলোবালির উপদ্রব, যাতে জ্যোৎস্নার আলো বাধা পেতে পারে–হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে চাঁদের এই রূপসুষমাকে উপভোগ করতে লাগলেন ওঁরা।

খানিকক্ষণ পরে নীরবতা ভাঙলেন আর্দাঁ। বললেন, 'দু'-দুটো চাঁদের দেখা পেলাম, কিন্তু আমাদের পৃথিবীটা গেল কোথায়?'

অন্য একটা জানালা দিয়ে দূরের কিছু একটার দিকে নির্দেশ করে বার্বিকেন বললেন, 'ওই যে দূরে রূপালি একটা চাকতি দেখা যাচ্ছে না? ওটাই আমাদের পৃথিবী।'

এবারে বিশ্রাম। যাত্রা শুরুর পর থেকে অভিযাত্রীদের অনেক ধকল সইতে হয়েছে। তাই আর দেরি না করে পাশাপাশি শুয়ে পড়লেন ওঁরা তিনজন। ক্লান্তিতে সবারই চোখ বুজে এসেছে প্রায়। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমানো যদিও খুব আরামদায়ক কিছু নয় তবুও শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের ঘুম নেমে এল ওঁদের চোখে–ব্যতিক্রম শুধু বার্বিকেন। ক্লান্তিতে তাঁরও চোখে ঢুলু ঢুলু। কিন্তু কি যেন ভাবছেন তিনি!

হঠাৎ 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন বার্বিকেন। তাঁর চিৎকারে নিকল আর আর্দাঁর কাঁচাঘুম ভেঙে গেল। দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'কি? কি খুঁজে পেয়েছেন, বার্বিকেন?'

'শব্দ-রহস্যের সমাধান।'

'তার মানে?' চোখ বড় বড় করে জানতে চাইলেন আর্দাঁ।

'মানে খুবই সহজ। কামান দাগার শব্দ আমরা শুনতে পাইনি কেন, জানেন?'

'না তো!'

'কারণ আমাদের প্রোজেক্টাইল শব্দের চেয়েও জোরে ছুটে চলেছে।'

ষোলো

বাড়িতে ঘুমালে নানারকম হাঁকডাক আর হৈ-চৈ। সমুদ্র? ওরেব্বাপ! জাহাজের দুলুনির চোটে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসার জোগাড়। বেলুনে চড়ে কেউ ঘুমাতে চাইলেও সেই একই সমস্যা। কিন্তু ঘুমানর জায়গাটা যদি মহাশূন্য হয় তাহলে এসব ঝামেলার বালাই নেই।

কাজেই বার্বিকেন নিকল আর আর্দাঁ খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে জেগে উঠবেন

না, এ তো সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু তবুও কার যেন করুণ স্বরের চিৎকারে ওঁদের ঘুম ভেঙে গেল।

আড়মোড়া ভেঙে চেঁচিয়ে উঠলেন আর্দাঁ, 'এ যে দেখছি কুকুরের কান্না!'

'নিশ্চয়ই খিদের জ্বালায় বেচারারা কাঁদছে,' নিকল বললেন।

'কিন্তু কুকুর দুটো গেল কোথায়?' বার্বিকেন জিজ্ঞেস করলেন।

'দাঁড়ান, পাজি দুটোকে খুঁজে বের করছি,' বলে ডিভানের নিচে উঁকি দিলেন আর্দাঁ। দেখলেন, মাদি কুকুরটা গুটিশুটি মেরে বসে রয়েছে আর থেকে থেকে করুণ সুরে ডেকে উঠছে। মোলায়েম কণ্ঠে 'নেপচুন', 'নেপচুন', বলে বারকয়েক ডাক দিতেই বেরিয়ে এল কুকুরটা–এসে আর্দাঁর পায়ের ওপর মুখ ঘষতে লাগল। তারপর তাঁর প্যান্ট কামড়ে ধরে নিয়ে যেতে চাইল ডিভানটার দিকে। আর্দাঁ আন্দাজ করলেন, স্যাটেলাইটও হয়ত ডিভানের নিচে কোথাও ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। এবারে ভাল করে খুঁজতে লেগে গেলেন তিনি। যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। ডিভানের নিচেই পাওয়া গেল স্যাটেলাইটকে। কুকুরটার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন আর্দাঁ–এবারও আগের সেই তোষামোদি কায়দায়। কিন্তু না, এত ডাকাডাকিতেও স্যাটেলাইট বেরিয়ে এল না। অগত্যা আর্দাঁকেই ডিভানের নিচে ঢুকতে হল। খুব ধীরে ধীরে যত্নের সঙ্গে স্যাটেলাইটকে তিনি টেনে বের করে আনলেন।

কুকুরটার সারা গায়ে রক্ত। বোঝাই যাচ্ছে, মাথার খুলি ফেটে গিয়ে অনবরত রক্ত ঝরেছে। জ্ঞান ফিরে আসার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তবুও চেষ্টার ত্রুটি করলেন না আর্দাঁ। স্যাটেলাইটকে তিনি শুইয়ে দিলেন একটা গদির ওপর। ডাক্তারি বিদ্যার যা কিছু জানা ছিল, সবই একে একে প্রয়োগ করলেন কুকুরটার ওপর। কিন্তু কোনই ফল হল না। খানিকক্ষণ পর মৃদু খিঁচুনি তুলে সবাইকে ছেড়ে চলে গেল স্যাটেলাইট।

'পারলাম না; সবার মায়া কাটিয়ে শেষমেষ চলেই গেল স্যাটেলাইট...' বলতে বলতে কণ্ঠ ধরে এল আর্দাঁর। নিকল আর বার্বিকেন দেখলেন, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে আর্দাঁর দু'চোখ বেয়ে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন সবাই। কুকুরটার মৃত্যুকে কেউই সহজভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। সবাই যে যার মত জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন। আর্দাঁই নীরবতা ভাঙলেন। বললেন, 'ইস্! কি ভুলই না করেছি আমরা। সূর্যের অপর দিকে যখন পৃথিবী ছিল তখন রওনা হলে বাড়তি কিছু দেখার সুযোগ পেতাম।'

'তাই নাকি! কি দেখতে পেতাম আমরা?' নিকল জিজ্ঞেস করলেন।

'পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চল। যেখানে আজ অব্দি কেউ পৌঁছতে পারেনি।'

ব্যস। শুরু হয়ে গল জোর বির্তক। নিকল আর বার্বিকেন আর্দাঁর কথাকে খণ্ডন করার জন্যে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক হিসেব নিকেশ হাজির করলেন; আর্দাঁও কম যান না–তিনিও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে ভূরিভূরি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা টেনে আনতে লাগলেন।

এভাবে কতক্ষণ চলত বলা যায় না।

হঠাৎ বার্বিকেনের চোখ পড়ল ঘড়ির ওপর। আঁতকে উঠলেন তিনি, 'অ্যাঁ? এ

যে দেখছি ন'টা বাজে! মঁশিয়ে, দোহাই লাগে আপনার; তর্কাতর্কি বাদ দিয়ে এবারে পেটপুজোর আয়োজন করুন।'

ফরাসীরা ভাল বাবুর্চি হয়। আর্দাঁ এ কথাটাকে আর একবার প্রমাণ করলেন। সত্যিই, এত অল্প সময়ের ভেতর এমন সুস্বাদু সুপ আর সব্জি রাঁধলেন যা না চেখে দেখলে বিশ্বাসই হতে চায় না। এরপর এল চা। আর সবশেষে এক বোতল চমৎকার মদ। গোলাতে খাবার-দাবার ভারবার সময় ব্র্যান্ডি ছাড়া অন্য কোন মদের উল্লেখ ছিল না; তাই একটু অবাক হয়েই আর্দাঁকে জিজ্ঞেস করলেন বার্বিকেন, 'এমন চমৎকার মদ কোত্থেকে জোগাড় করলেন, মঁশিয়ে?'

গলায় কপট গাম্ভীর্য এনে আর্দাঁ বললেন, 'খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎই পেয়ে গেছি বোতলটা!'

যাত্রার পর প্রায় বারো ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলেছে প্রোজেক্টাইল। গোলার জানালা দিয়ে তাকালে দেখা যায়, ছোট্ট একটা নীলচে গোলক দূর মহাশূন্যে ভাসছে–সেই ছোট্ট গোলাটার নামই নাকি পৃথিবী। প্রোজেক্টাইল যতই ছুটে চলেছে, গোলাটাও ধীরে ধীরে ততই ছোট হয়ে আসছে। আর রূপালি চাঁদটা? সামান্য ফুলে থাকা একটা বেলুনে ধীরে ধীরে বাতাস ঢোকালে বেলুনটা যেমন ফুলে ফেঁপে ওঠে, গোলার জানালা দিয়ে চাঁদটাকে দেখলে ঠিক তেমনই মনে হয়। গোলা যতই সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে, চাঁদটাও যেন বেলুনের মতই ধীরে ধীরে ফুলে ফেঁপে উঠছে।

একটু একটু করে প্রোজেক্টাইল তেতে উঠছে। আর্দাঁ বললেন, 'গোলাটা যেভাবে গরম হয়ে উঠছে তাতে ভয় হচ্ছে, শেষে গলেই না যায় আবার!'

'না, সে-ভয় নেই,' বললেন বার্বিকেন। 'কামান দাগার উত্তাপ যখন সইতে পেরেছে, তখন এ উত্তাপে প্রোজেক্টাইলের কোন ক্ষতিই হবে না। যদি কোনদিন পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় তাহলে টাম্পার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন, কামান দাগার সময় ওরা এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে কলাম্বিয়াডের মুখ দিয়ে বের হয়ে যেতে দেখেছিল!'

এভাবে খোশগল্প আর তর্কবিতর্কে সময়টা ভালই কেটে যেতে লাগল। সেই সঙ্গে জানালা দিয়ে চেয়ে মহাশূন্যের অপরূপ সৌন্দর্যকেও প্রাণভরে উপভোগ করতে লাগলেন ওঁরা। দিনরাত্রির ঝামেলা নেই–তবু ঘড়ির কাঁটা ধরেই চলছে ওঁদের কাজকর্ম।

হঠাৎ আর্দাঁ টের পেলেন–শ্বাস নিতে গিয়ে কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে কোন অসুবিধা হল না তাঁর। আসলে গোলায় কার্বন-ডাই অক্সাইড জমে বাতাসকে দূষিত করে ফেলেছে। দেরি না করে তাড়াতাড়ি পটাশিয়াম ক্লোরেটের কৌটো খুলে ধরলেন তিনি। কিছুক্ষণের ভেতরেই কার্বন-ডাই অক্সাইডকে শুষে নিল পটাশিয়াম ক্লোরেট। শ্বাস নেয়ায় আর কোন ঝামেলা রইল না।

পৃথিবীর হিসেবে মহাশূন্যে ওদের চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ একদিন পেরিয়ে গেছে। ক্লান্তিতে আবারও চোখ বুজে এসেছে সবার। তাই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেন সবাই। প্রায় সাথে সাথে গভীর ঘুমে ঢলে পড়লেন ওঁরা। কিন্তু প্রোজেক্টাইলের কোন বিরাম নেই; মহাশূন্যের পথ বেয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে গোলাটা।

সতেরো

তেসরা ডিসেম্বরের সকাল। মোরগের ডাক শুনে বার্বিকেন আর নিকল ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। চোখ কচলে চারদিকে ভাল করে একবার চেয়ে দেখলেন নিকল। না, কিছুই চোখে পড়ল না তাঁর। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছেন তিনি। বার্বিকেনেরও একই অবস্থা। মহাশূন্যে মোরগের ডাক–এ যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। ওদের অবাক হবার আরও বাকি ছিল–'কুক্কুরু কু' শব্দে আরারও ডেকে উঠল একটা মোরগ। বার্বিকেন লক্ষ করলেন, শব্দটা ডিভানের নিচ থেকেই আসছে। ঝট্ করে উঠে গিয়ে ডিভানের তলায় উঁকি দিলেন তিনি। যা দেখলেন তাতে তাঁর আক্কেল গুড়ুম! দু'হাত অদ্ভুত কায়দায় মুখে চেপে ধরে মোরগের ডাক ডেকে চলেছেন মাইকেল আর্দাঁ! আর্দাঁর কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল দু'জনার।

'ঘুম ভাঙানর পুরানো কায়দাটা মহাশূন্যেও বেশ কাজ দেয়,' নিকল আর বার্বিকেনের দম ফাটানো হাসি থামলে গম্ভীর গলায় মন্তব্য করলেন আর্দাঁ।

হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে দিনের শুরু হল। এরপর ব্রেকফাস্টের পালা। যথারীতি বাবুর্চিগিরিতে লেগে গেলেন আর্দাঁ। চা নাস্তার পাট চুকে যেতেই কাগজকলম নিয়ে হিসেব কষতে বসলেন নিকল। খানিকক্ষণ কি যেন একমনে লিখলেন তিনি। তারপর বার্বিকেনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে নিউট্রাল পয়েন্ট, অর্থাৎ যে জায়গায় চাঁদ আর পৃথিবীর আকর্ষণ সমান, সেখানে পৌঁছতে প্রোজেক্টাইলের গতিবেগে কোন তারতম্য হলে চলবে কি?'

'না।' বার্বিকেন বললেন, 'কেমব্রিজ মানমন্দিরের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা রায় দিয়েছেন, কোন অবস্থাতেই গোলার গতিবেগ সেকেন্ডে বারো হাজার গজের কম হলে চলবে না।'

'সর্বনাশ।' আঁতকে উঠলেন নিকল।

'এতে সর্বনাশের কি হল বুঝলাম না। গতিবেগ যদিও বা একটু কমে গিয়ে থাকে তাতে ক্ষতি কি? আমরা তো চাঁদের দিকেই এগিয়ে চলেছি।'

'বাতাসের ঘষায় গোলার গতিবেগ একটু আধটু কমেনি–কমেছে তিন ভাগের এক ভাগ। কেমব্রিজের পণ্ডিতদের মাথায়ই আসেনি, বায়ুমণ্ডল পেরুতে গিয়ে গোলার গতিবেগ কমতে পারে।'

'তাহলে শুরুতে গতিবেগ কত হওয়া দরকার ছিল?'

'সেকেন্ডে আঠারো হাজার গজ।'

'সেরেছে! শেষমেষ গোটা পরিকল্পনাটাই বুঝি ভণ্ডুল হয়ে গেল,' বড় বড় চোখ করে বললেন আর্দাঁ।

'আপসোস করে এখন আর কোন ফায়দা হবে না। গোড়াতেই ভুল হয়েছিল আমাদের। কেমব্রিজ মানমন্দিরের মতামতকে যাচাই না করে অন্ধের মত মেনে

নেয়া আমাদের মোটেও উচিত হয়নি!' ক্ষোভ প্রকাশ পেল বার্বিকেনের কণ্ঠে।

'এখন তাহলে কি হবে?' জিজ্ঞেস করলেন আর্দাঁ।

'দুটো ঘটনা ঘটতে পারে,' বার্বিকেন বললেন, 'গোলাটা হয় পৃথিবীতে ফিরে যাবে নয়ত পৃথিবীর উপগ্রহ হয়ে অনন্তকাল ঘুরতে থাকবে। কিন্তু প্রোজেক্টাইল কখনই নিউট্রাল পয়েন্টে কিংবা চাঁদে পৌঁছতে পারবে না।'

বার্বিকেনের কথায় মেজাজ খিঁচড়ে গেল আর্দাঁর, বললেন, 'এখন গোলাটা যদি কেমব্রিজ মানমন্দিরের ওপর আছড়ে পড়ত তাহলে বেশ হত। ভুল তথ্য দেয়ার মজাটা টের পাইয়ে দিতাম ব্যাটাদের।'

আর্দাঁ আর বার্বিকেনের কথার ফাঁকে ফাঁকে একমনে হিসেব কষে চলেছেন নিকল। এবার তিনি বলে উঠলেন, 'যাত্রা শুরুর তিন দিন প্রায় পার হতে চলেছে। কিন্তু কই, পৃথিবীর দিকে ফিরে যাচ্ছি বলে তো মনে হচ্ছে না!'

'তাহলে কি আমরা চাঁদের দিকেই ছুটে চলেছি?' কিন্তু তা-ই বা হয় কি করে!' আর্দাঁর কণ্ঠে বিস্ময়।

'হ্যাঁ, মঁশিয়ে, আমরা চাঁদের দিকেই ছুটে চলেছি,' নিকল বলতে লাগলেন, 'গতিবেগ কমে না গিয়ে থাকলে হিসেব মত তিন ভাগের দু'ভাগ পথ পেরিয়ে এসেছি আমরা।'

'আমরা যে এগিয়ে যাচ্ছি তারই বা প্রমাণ কি?' বার্বিকেন জিজ্ঞেস করলেন।

'দেখছেন না! চাঁদটা একটু একটু করে বড় দেখাচ্ছে? আমরা পৃথিবীর দিকে ফিরে যেতে থাকলে এর উল্টোটাই দেখতে পেতাম।'

'তা নাহয় বুঝলাম; কিন্তু এজন্যে যে বাড়তি গতিবেগের দরকার তা কোত্থেকে এল?'

'কামান দাগার সময়েই গোলার গতিবেগ বারো হাজার গজের চেয়ে কিছু বেশি ছিল । এছাড়া ধাক্কা সামলানর জন্যে গোলার ভেতরে যেটুকু পানি ভরা হয়েছিল তার সবটুকু পাইপ দিয়ে বের হয়ে যায়। ফলে হালকা হয়ে গিয়েছিল গোলাটা। আর সেজন্যেই প্রোজেক্টাইলের যাত্রা শুরুর গতিবেগ ছিল বারো হাজার গজের চেয়ে অনেক বেশি।'

'বড় বাঁচা বেঁচে গেলাম,' স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে মন্তব্য করলেন আর্দাঁ, নইলে প্রোজেক্টাইলকে অনন্তকাল মহাশূন্যেই মাথা কুটে মরতে হত; সেই সঙ্গে মরে ভূত হতাম আমরাও।'

কেমব্রিজ মানমন্দিরের এত বড় ভুলটা যে আপনাআপনি শুধরে যাবে, অভিযাত্রীদের কেউই তা আশা করেননি। সবাই বেজায় খুশি। তোষামোদ ছাড়াই দুপুরের রান্নায় লেগে গেলেন আর্দাঁ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চুকে গেল রান্নার পাট।

সবার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আর্দাঁ বললেন, 'চলুন, একহাত হয়ে যাক–তাস, দাবা কিংবা ডোমিনো।'

'তার মানে? এসব খেলার সরঞ্জামও কি সঙ্গে করে এনেছেন নাকি?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন বার্বিকেন।

'এনেছি। জায়গায় কুলোবে না ভেবে বিলিয়ার্ড টেবিলটাই কেবল আনা হয়নি,' মুচকি হেসে আর্দাঁ বললেন, 'খেলাধুলায় সময়টা ভালই কাটবে, এছাড়া চাঁদের

অধিবাসীদেরকেও এসব শেখানো দরকার।'

'অধিবাসী বলে সেখানে আদৌ কিছু আছে কিনা কে জানে।' ফোড়ন কাটলেন নিকল।

'যদি থেকেও থাকে; তাহলে জানবেন–শিক্ষা-দীক্ষা কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের চাইতে তারা কয়েক শতাব্দী এগিয়ে রয়েছে। কাজেই আমাদের কাছ থেকে তাদের শিখবার কিছু তো নেই-ই বরং তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু আমাদের শেখার রয়েছে।'

বার্বিকেনের এই যুক্তি আর্দাঁর পছন্দ হল না। তিনি বললেন, 'আচ্ছা; পৃথিবীর চাইতে চাঁদের লোকজনেরা শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে–এর কি কোন প্রমাণ রয়েছে?'

'না; তা অবশ্য নেই। তবে বাঘা বিজ্ঞানীদের কথা হল, চাঁদ নাকি পৃথিবীর আগে ঠাণ্ডা হয়েছে। কাজেই চাঁদে প্রাণী থেকে থাকলে তারা তো আমাদের চেয়ে শিক্ষা-দীক্ষা কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হবেই।'

'যদি তাই হবে তাহলে এতদিনেও তারা প্রোজেক্টাইলের মত গোলা পৃথিবীতে পাঠায়নি কেন?'

'পাঠায়নি এ কথা জানলেন কেমন করে? আমাদের মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর ছ'ভাগের পাঁচ ভাগই পানি। কাজেই ওরা যদি গোলা পাঠিয়েও থাকে তবে তা মাটিতে না পড়ে সমুদ্রে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

'প্রমাণ চাই, বার্বিকেন, হাতেনাতে প্রমাণ। যাকগে সে কথা; তবে একটা জিনিস ওরা এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি–সেটা কি, জানেন?'

'কি?'

'কামান আর বারুদ!' গম্ভীর গলায় বললেন আর্দাঁ, 'নইলে ওদের পাঠানো দু'চারটা প্রোজেক্টাইল মাটিতেও পড়ত।'

আর্দাঁর কথায় বার্বিকেন গুম মেরে গেলেও নিকল কিন্তু হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেলেন।

ওদের আলাপে ছেদ পড়ল। হঠাৎ করুণ সুরে কেঁদে উঠল নেপচুন। আর্দাঁ উঠে গিয়ে দেখলেন, স্যাটেলাইটের মৃতদেহকে আগলে বসে রয়েছে নেপচুন; আর একটু পর পরই থেকে থেকে কেঁদে উঠছে। 'আহা রে, বেচারি!' বলে নেপচুনকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আর্দাঁ। বার্বিকেন বললেন, 'স্যাটেলাইটের একটা গতি করা দরকার, নইলে কিছুক্ষণ পর গোলার বাতাস দুষিত হয়ে পড়বে।'

'জানালার কাঁচ খুলে ফেলে মড়াটাকে বাইরে ফেলে দিতে হবে: কিন্তু খুব সাবধান–খোলা জানালা দিয়ে অক্সিজেন বেরিয়ে গেলেই বিপদ। এছাড়া জানালা বেশিক্ষণ খোলা থাকলে বাইরের কনকনে ঠাণ্ডা ভেতরে ঢুকে পড়বে। বেঁচে থাকাই মুশকিল হয়ে পড়বে তখন,' বললেন নিকল।

'কিন্তু সূর্যের উত্তাপ তো আমরা পাচ্ছিই!' আর্দাঁ বললেন।

'আমরা পাচ্ছি না; পাচ্ছে প্রোজেক্টাইলের উপরিভাগ। সূর্যের তাপে গোলার গা গরম হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বাতাসবিহীন মহাশূন্য মোটেও উত্তপ্ত হচ্ছে না; কারণ সূর্যের আলো কোনকিছুতে বাধা না পেলে উত্তাপ টের পাওয়া যায় না।'

*

স্যাটেলাইটকে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে হবে। বার্বিকেন দক্ষ হাতে জানালার কাঁচ খুলে ফেলতেই আর্দাঁ আর নিকল মিলে মড়াটাকে বাইরে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর প্লেট এঁটে দিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলেন বার্বিকেন। গোটা কাজটা সারতে লাগল মাত্র কয়েক সেকেন্ড–এতে যেটুকু অক্সিজেন বাইরে বেরিয়ে গেল তা খুবই সামান্য। বার্বিকেন মনে মনে ঠিক করলেন, এখন থেকে অপ্রয়োজনীয় যা কিছু সবই জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিতে হবে। এতে করে গোলার ভেতরে ওদের হাঁটা চলায় সুবিধা হবে।

আঠারো

ডিসেম্বরের চার তারিখ। বেশ সকাল সকালই ঘুম থেকে জেগে উঠলেন অভিযাত্রীরা। যাত্রা শুরুর প্রায় ষাট ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। হিসেবমত দশ ভাগের আট ভাগ পথ পাড়ি দিয়েছেন ওঁরা।

গোলার জানালা দিয়ে চেয়ে পৃথিবীকে এখন আর দেখা যায় না। শুধু আবছা ছাই রংয়ের কিছু একটা নজরে পড়ে। অভিযাত্রীরা বুঝতে পারলেন, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ সীমানার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে প্রোজেক্টাইল।

হঠাৎ নীরবতা ভেঙে বলে উঠলেন আর্দাঁ, 'বার্বিকেন, প্রোজেক্টাইলের যদি ব্রেক থাকত আর তা দিয়ে হঠাৎ যদি একে মহাশূন্যে থমকে দেয়া যেত, তাহলে কি হত অবস্থাটা?'

'দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যেত।'

'ধরুন, আমাদের পৃথিবীটা যদি হঠাৎ গতি হারায়, তাহলে?'

'চোখের পলকে সবকিছু ছাই হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, পৃথিবীটা যদি সূর্যের বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তাহলে কি হবে?' এবার নিকল জানতে চাইলেন।

'পৃথিবীর সমান ১৬০০০ কয়লা পিণ্ডকে পোড়ালে যে উত্তাপ সৃষ্টি হবার কথা, পৃথিবীটা সূর্যের বুকে আছড়ে পড়লে সেই একই উত্তাপ পাওয়া যাবে। আসলে এতে অবাক হবার কিছু নেই; কোনকিছুর গতিকে হঠাৎ থামিয়ে দিতে পারলেই উত্তাপ পাওয়া যায়।' বার্বিকেন বললেন।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন আর্দাঁ। হঠাৎ কি দেখে যেন চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর চেঁচামেচিতে বাকি দু'জনও উঠে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়ালেন। ওঁরা দেখতে পেলেন, খানিকটা দূরে লম্বাটে থলির মত কি যেন একটা প্রোজেক্টাইলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে। দেখে মনে হয় গতিহীন; এর মানে একই গতিতে গোলার সাথে সাথে ওই জিনিসটাও চাঁদের দিকে ধেয়ে চলেছে।

জিনিসটা কি, এ নিয়ে তুমুল তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত জিতে গেলেন আর্দাঁই। তিনি বললেন, 'ওটা উল্কাটুল্কা কিছু নয়; তবে আমি জানি, জিনিসটা

কি!'

'তাহলে চুপ করে আছেন কেন? জলদি বলে ফেলুন।' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন নিকল আর বার্বিকেন।

'ওটা আর কিছুই নয়–এ অভিযানের প্রথম শহীদ–বেচারা স্যাটেলাইট। বিশ্বাস না হয় তো দূরবীন লাগিয়ে দেখুন।'

দূরবীন চোখে দিয়ে তাকাতেই স্যাটেলাইটকে চেনা গেল, কিন্তু এ কি অবস্থা হয়েছে তার! শরীরটা যেন ভারি কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে একেবারে চেপ্টা হয়ে গেছে। ওঁরা বুঝতে পারলেন, প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে বলেই এমনটি হয়েছে। অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু মড়াটা এখনও প্রোজেক্টাইলের পিছু ছাড়ছে না দেখে আর্দাঁ আর নিকল দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। গোলার সঙ্গে স্যাটেলাইটের ঘষা লাগলে না জানি কি কাণ্ড ঘটে যায়! বার্বিকেন তখন বললেন, 'এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। স্যাটেলাইটের সঙ্গে গোলার ঠোকাঠুকি হবে না; কারণ মড়াটা সবসময়ে একই দূরত্ব বজায় রেখে আমাদের অনুসরণ করবে। মহাশূন্যের তো এই-ই নিয়ম। এখানে বড় জিনিস ছোট জিনিসকে আকর্ষণ করে।

পরের দিন সকাল থেকেই একটা ব্যাপার বার্বিকেনকে ভাবিয়ে তুলল। গোলাটা যতই এগিয়ে যাচ্ছে, চাঁদটাও ওদের কাছে ধীরে ধীরে বড় দেখাচ্ছে ঠিকই–কিন্তু মনে হচ্ছে, গোলাটা যেন চাঁদের কেন্দ্র লক্ষ করে ছুটছে না। গতিটা যেন একটু উত্তরমুখী। মনে হচ্ছে, চাঁদের কেন্দ্রে নামার বদলে শেষ পর্যন্ত উত্তর দিককার কোন এলাকায় নেমে পড়বে গোলাটা। কিন্তু গতিপথ যদি বেশ খানিকটা ঘুরে গিয়ে থাকে তাহলে চাঁদে নামাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া গোলাটা যদি চাঁদের গা ঘেঁষে বেরিয়ে যেতে চায় তাহলে আরেক বিপত্তিতে পড়তে হবে। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ-প্রোজেক্টাইলকে টেনে ধরবে। তখন চাঁদে নামা তো হবেই না বরং অনন্তকাল চাঁদের উপগ্রহ হয়েই গোলাটাকে অবিরাম ঘুরতে হবে। তবুও ভাল–কিন্তু গতিপথ যদি খুব বেশি ঘুরে গিয়ে থাকে তাহলে অসীম মহাশূন্যের পথ ধরে ছুটে যাবে প্রোজেক্টাইল।

দেখতে দেখতে চাঁদটা অনেক বড় হয়ে উঠেছে। চাঁদের গায়ে যেসব পাহাড়-পর্বত আর চড়াই-উতরাই রয়েছে সেগুলো ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কবি সাহিত্যিকের বর্ণনায় চাঁদ যত সুন্দর; বাস্তবে কিন্তু তার উল্টো–কদাকার বললেও যেন কম বলা হয়। চাঁদের এ চেহারা দেখে আর্দাঁ আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, 'কি আমার চেহারা রে! থ্যাবড়া নাক, মুখ ভর্তি ব্রন, আর কি বিটকেলে চাউনি! ইনিই নাকি আবার অ্যাপোলোর বোন!'

'কবি সাহিত্যিকদের কাছে কথাটা একবার বলেই দেখুন না! আস্ত চিবিয়ে খাবে আপনাকে!' নিকল বলতে লাগলেন, 'এবারে আমার একটা কথার জবাব দিন তো; আমরা তো চাঁদে নামছি ঠিকই–কিন্তু ফিরব কেমন করে?'

'ফিরে যাবার আদৌ কোন উপায় আছে কিনা আমার জানা নেই। আর উপায় জেনে কি-ই বা লাভ? আমি তো কোনদিনই ফিরে যাব না!'

'ফিরে যাবার একটা উপায় কিন্তু রয়েছে,' বার্বিকেন বললেন।

'জলদি বলুন, উপায়টা কি?' একরাশ উৎকণ্ঠা নিকলের কণ্ঠে।

'চাঁদে নামার পরেও প্রোজেক্টাইল মোটামুটি অক্ষতই থেকে যাবে। কামান তৈরির জন্যে লাগবে লোহা ও অন্যান্য মালমশলা–আমার বিশ্বাস চাঁদে এসবের অভাব হবে না। আর বারুদও সময়মত বানিয়ে নেয়া যাবে। মাঝারি সাইজের একটা কামান তৈরি করলেই চলবে। কারণ চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ অনেক কম। হাজার পঁচিশেক মাইল পাড়ি দিতে পারলেই পৃথিবীর টানে গিয়ে পড়ব আমরা।'

'যাক, বাঁচা গেল!' নিকল যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

'আসার সময় প্রোজেক্টাইলের সঙ্গে একটা সুতো বেঁধে দিলে মন্দ হত না। খবর দেয়া নেয়ার কাজে চমৎকার ব্যবহার করা যেত।'

আর্দাঁর কথায় নিকল ভেংচি কেটে বললেন, 'মাথার স্ক্রু ঢিলা নাকি! আড়াই লক্ষ মাইল লম্বা সুতোর ওজন কত, ভেবে দেখেছেন একবার? এছাড়া চব্বিশ-ঘণ্টাই পৃথিবীটা বনবনিয়ে ঘুরছে। যদিও বা সুতোটা খুবই শক্ত হয় তাহলে, লাটাই ঘুরোলে ঘুড়ি যেমন মাটিতে নেমে আসে, আমরাও ঠিক তেমনি পৃথিবীতে আছড়ে পড়তাম।'

'তবে তো ম্যাস্টনের পোয়াবারো, প্রোজেক্টাইলের দ্বিতীয় যাত্রায়ও কেউ যদি তাকে বাদ দিতে চায় তাহলে হলফ করে বলতে পারি–রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যাবে।'

আর্দাঁর কথায় বাকি দু'জন হৈ-হৈ করে উঠলেন। কিন্তু ব্যাপার কি! কেন এত হৈ-চৈ; মুখ দিয়ে কেনই বা কথার খৈ ফুটছে–নাকি এসবই চাঁদের প্রভাবের ফল! ওঁদের চিন্তা রাজ্যে হঠাৎ করেই এমন কিছুর আমদানি হয়েছে, যা নাকি সুস্থ চিন্তা থেকে ওঁদেরকে দূরে সরিয়ে রাখছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, ওঁদের কেউই কিছু বুঝতে পারছেন না। অথচ ধীরে ধীরে উত্তেজনা বেড়েই চলেছে ওঁদের। একেকজন হাপরের মত হাঁপাচ্ছেন তবুও মুখে কথার কমতি নেই।

আগের কথা নিয়েই রীতিমত ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। নিজের আসনে ধাঁই করে ঘুসি মেরে নিকল বললেন, 'পৃথিবীতে ফেরা যাবে কিনা সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে চাঁদে যাবার জন্যে আমাকে ফাঁসালেন কেন?'

'আপনি নিজের ইচ্ছেতেই আমাদের সঙ্গী হয়েছেন,' গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেন বার্বিকেন।

'খবরদার! আর একটা মিথ্যে কথা বলেছেন কি এক ঘুসিতে নাক ফাটিয়ে দেব!' বলে জামার আস্তিন গুটিয়ে নিলেন নিকল। বার্বিকেনও আস্তিন গুটিয়ে নিকেলের দিকে তেড়ে এলেন।

ওদের দু'জনের মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন আর্দাঁ। বললেন, 'হাতাহাতির প্রয়োজন নেই; পৃথিবীতে ফেরার উপায় আমার জানা আছে।'

'জানা আছে তো বলছেন না কেন?' দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন।

'বলা না বলা আমার ইচ্ছে।'

'কি? এতবড় কথা!' বলে দু'জন দু'দিক থেকে আর্দাঁর কোটের আস্তিন খামচে ধরলেন। এরপর আরও মজার কাণ্ড ঘটল।

নিকল আর বার্বিকেন অদ্ভুত ভঙ্গিমায় ডিগবাজি খেতে লাগলেন। ওঁদের দেখাদেখি আর্দাঁরও মাথায় যেন ভূত চাপল। আগের কায়দায় মোরগের ডাক ডেকে চললেন তিনি।

পাগলামির চূড়ান্তে পৌঁছনর আগেই হঠাৎ কি যেন হল। তিনজন প্রায় একসঙ্গে চিৎপটাং। একজন আরেকজনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। বেশ বোঝা গেল–জ্ঞান হারিয়েছেন ওঁরা।

উনিশ

জ্ঞান ফিরে পেতেই প্রচণ্ড খিদে অনুভব করলেন নিকল। বাঁকি দু'জন তখনও বেহুঁশ। খিদের চোটে নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাবার জোগাড়; অথচ কিছুক্ষণ আগেই পেটপুরে খেয়েছেন তিনি। উঠে চুলো জ্বালতে গেলেন। চা আর স্যান্ডউইচ দিয়েই আপাতত ক্ষুধা মেটাতে হবে। আর্দাকে ডেকে কোন কাজ হল না। একেবারে মড়ার মত পড়ে রয়েছেন তিনি। বার্বিকেনেরও একই অবস্থা। তাই রান্নার কাজে নিজেই নেমে পড়লেন।

চুলোতে আগুন জ্বালানর জন্যে নিকল যেই দিয়াশলাই জ্বেলেছেন, অমনি চোখ ধাঁধানো আলোয় ছেয়ে গেল গোলার ভেতরটা। চুলোতে আগুন ধরাতেই চোখের সামনে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। রান্নাবান্না দূরে থাক; আলোর উজ্জ্বলতার জন্যে চুলোর দিকে ভাল করে তাকানই যাচ্ছে না!

একটু আগে ওদের খ্যাপামি, জ্ঞান হারিয়ে ফেলা আর এখন চোখ ধাঁধানো আলোর রহস্য–এসবের উত্তর হঠাৎই যেন পেয়ে গেলেন নিকল। আচমকা 'অক্সিজেন,' 'অক্সিজেন' বলে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। একদৌড়ে ছুটে গেলেন অক্সিজেনের পাত্রটার কাছে। যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। পাত্রের চাবিটা সম্পূর্ণ খোলা। নল দিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অক্সিজেন বেরিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চাবির প্যাঁচ ঘুরিয়ে দিলেন তিনি। ধীরে ধীরে বাড়তি অক্সিজেন কমে আসতে লাগল। চুলোর আগুনও স্বাভাবিক হয়ে এল। নিকল বেশ বুঝতে পারলেন–মগজের মধ্যে এতক্ষণ যে দাপাদাপি চলছিল, কোন এক মন্ত্রবলে তা যেন একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে বাকি দু'জনও জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। পড়ে থাকা অবস্থায় মিটমিট করে চাইলেন আর্দাঁ। চুলোর দিকে নজর গেল। ভাল করে লক্ষ করতেই চোখ কপালে উঠল তাঁর–পাকা বাবুর্চির মত একমনে রান্না করছেন নিকল। হেঁকে উঠলেন আর্দাঁ, 'নিকল, রান্নাটা দয়া করে একটু জলদি জলদি সেরে ফেলুন, নইলে কিন্তু খিদের জ্বালায় ফের জ্ঞান হারিয়ে ফেলব।'

ওদের দু'জনের কাছে এসে নিকল বললেন, 'খাবার এক্ষুণি রেডি হয়ে যাবে; স্যান্ডউইচ আর চা। কিন্তু তার আগে একটা ব্যাপারের ফয়সালা হয়ে যাক–কিছুক্ষণ আগে এতসব কাণ্ড কারখানা ঘটে গেল, এর জন্যে দায়ী কে?'

'নিশ্চয়ই আমরা কেউ নই,' বললেন আর্দাঁ।

'কিন্তু যদি বলি আমাদেরই কেউ পুরো ঘটনাটার জন্যে দায়ী?'

'অসম্ভব,' জোর দিয়ে বললেন বার্বিকেন।

'একশোবার সম্ভব,' আর্দাঁর দিকে চেয়ে নিকল বললেন, 'গণ্ডগোলটা বাধিয়েছিলেন আপনিই।'

'আ-আমি!' যেন আকাশ থেকে পড়লেন আর্দাঁ।

'জ্বী, জনাব, আপনি। রান্নার সময় অক্সিজেনের চাবিটা পুরোই খুলে রেখেছিলেন; আর সেজন্যেই তো প্রয়োজনের বেশি অক্সিজেন আমাদের ফুসফুসে গিয়ে পাগলামি শুরু হয়েছিল।'

বিন্দুমাত্র দমে না গিয়ে আর্দাঁ বললেন, 'বাড়তি অক্সিজেন দিয়ে গোমড়ামুখোদের মুখে যদি হাসি ফুটিয়ে তোলা যায়, কিংবা চিরদুঃখীদের মনে আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়া যায় তো মন্দ কি! আর এজন্যে যদি কাঠগড়াতে দাঁড়াতে হয় তো তাতেও আমি রাজি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হল স্যান্ডউইচ আর চা। একেকজন গোগ্রাসে গিলে চললেন স্যান্ডউইচ। ওঁরা যে হারে খেয়ে যাচ্ছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল যে কয়েকদিন ধরে পেটে কিছুই পড়েনি ওঁদের।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছেড়ে আসার পর থেকে প্রোজেক্টাইলের ওজন কমে যাচ্ছিল। শুধু প্রোজেক্টাইলেরই নয়; গোলার ভেতরকার সবকিছুর। দাঁড়িপাল্লায় ওজনের ফারাকটুকু ধরা পড়বে না, কারণ আনুপাতিক হারে বাটখারার ওজনও কমে গিয়েছে।

ক্যাপ্টেন নিকল হিসেব কষে দেখলেন, যদি গতিপথ ঠিক থেকে থাকে তো জায়গামত পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই। এ ক'দিনে প্রোজেক্টাইল পাড়ি দিয়েছে প্রায় সোয়া দু'লাখ মাইল পথ।

গোলাটা জায়গামত পৌঁছনর পর কি হবে তাই নিয়ে আর্দাঁ ভেবেই অস্থির। শেষমেষ বার্বিকেনকে তিনি জিজ্ঞেসই করে বসলেন, 'ধরুন, গোলাটা নির্বিঘ্নেই নিউট্রাল পয়েন্টে পৌঁছল; কিন্তু তারপর কি হবে?'

'তিনরকম ঘটনা ঘটতে পারে,' বার্বিকেন বলতে লাগলেন, 'গোলাটা উদাসীন অঞ্চল পেরিয়ে চাঁদে গিয়ে পৌঁছবে; অথবা উদাসীন অঞ্চলে পৌঁছেও গতিবেগ যদি হঠাৎ কমে যেতে থাকে, তাহলে পৃথিবীতেই আবার ফিরে আসতে হবে। কিংবা এমনও হতে পারে, উদাসীন অঞ্চলে পৌঁছে গতিবেগ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলল প্রোজেক্টাইল। তখন পৃথিবী আর চাঁদের সমান আকর্ষণ থাকার জন্যে গোলাটাকে চিরকাল ওই জায়গাতেই ঝুলে থাকতে হবে।'

কিছুক্ষণ পরে উদাসীন অঞ্চলে ঢুকল প্রোজেক্টাইল। প্রথমে কেউ কিছু বুঝতে পারেননি। নিকল প্রথম টের পেলেন। তাঁর হাত ফস্কে, একটা গ্লাস পড়ে যাচ্ছিল; কিন্তু কি আশ্চর্য! গ্লাসটা গোলার মেঝেতে না পড়ে দিব্যি শূন্যে ভাসতে লাগল! উদাসীন অঞ্চলে ঢুকতে পেরে বাচ্চাছেলের মত খুশিতে চিৎকার করে উঠলেন আর্দাঁ। জলদি করে একটা দামি মদের বোতল কোত্থেকে যেন জোগাড় করে আনলেন তিনি। অবাক হবার তখনও আরও বাকি ছিল। আর্দাঁ ছিপি খুলে মদ ঢালতে লাগলেন। কিন্তু এক ফোঁটা মদও গ্লাসে ঢালা গেল না। তরল পদার্থের ফোয়ারা যেন শূন্যে ভেসে বেড়াতে লাগল।

এসমস্ত কিছুই যদিও বিজ্ঞানের নিয়মেই ঘটছে তবুও অভিযাত্রীরা অবাক না হয়ে

পারলেন না। ওজনশূন্য হয়ে ভেসে বেড়াবার কথা বিজ্ঞান কেবল কাগজে কলমে লিখে দিয়েই খালাস, কিন্তু ওরা ছাড়া আর কেউ কি এরকমটা নিজের চোখে কখনও দেখতে পেরেছে? ওজনশূন্যতার খেলা যেন ম্যাজিককেও হার মানিয়ে দেয়। নিকল উত্তেজনার বশে লাফিয়ে উঠেছিলেন; ব্যস, আর যায় কোথায়! সেই যে তিনি শূন্যে খাড়া হয়ে রইলেন, নামার জোগাড় নেই। আর্দাঁ আরও একটা মজার কাণ্ড করলেন। নেপচুনকে এনে তিনি বসিয়ে দিলেন শূন্যে। বেচারি নেপচুন! ভয়ে, বিস্ময়ে তার এমনই অবস্থা হল যে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

নিকলকে মেঝেতে নামতে সাহায্য করলেন বার্বিকেন। মেঝেয় পা পড়তেই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। গা, হাত-পা নাড়াচাড়া করে এতক্ষণের স্থবির ভাবটাকে কাটানর চেষ্টা করতে লাগলেন–তবে তা খুবই আস্তে ধীরে। বার্বিকেন নিকলকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললেন, 'উদাসীন অঞ্চল পেরুলেই চাঁদের মাধ্যাকর্ষণে গিয়ে পড়ব আমরা। তখন সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে আসবে। পৃথিবীতে আমাদের যতটুকু ওজন, যখন চাঁদে নামব তখন তা কমে গিয়ে মাত্র দু'ভাগের একভাগে এসে ঠেকবে।'

'গা-গতরের শক্তি কমে যাবে না তো!' আর্দাঁ জানতে চাইলেন।

'মোটেই না। বরং মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব অনেক কম থাকবে বলে অল্প পরিশ্রমে বেশি হাঁটাচলা করা যাবে। পৃথিবীতে যে তিন ফুট লাফিয়ে পেরুতে পারে, চাঁদে সে এক লাফে আঠারো ফুট পার হতে পারবে।'

'কিন্তু চাঁদের মানুষদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠব তো?'

'নিশ্চয়ই। আয়তনে চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। সেখানকার মানুষগুলোও সেই অনুপাতে ছোটই হবে।'

'লিলিপুট!' নিকল মন্তব্য করলেন।

'তাহলে আমাদের আর পায় কে!' আর্দাঁ বলে চললেন, 'ওরা যদি দেখতে সত্যি সত্যিই লিলিপুটের মত হয় তাহলে ওদের চোখে আমরাও হব গালিভার। দৈত্যের ভূমিকায় তখন তিনজনই একসঙ্গে অভিনয় করব।'

'কিন্তু এর উল্টোটা হবে যদি বৃহস্পতি কিংবা শনি গ্রহে যাওয়া যায়; কারণ দুটোই পৃথিবীর চাইতে অনেক বড়। আর সূর্যে যেতে চাইলে তো কপিকল সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে!' বললেন বার্বিকেন।

'কেন?' একসঙ্গে জানতে চাইলেন নিকল আর আর্দাঁ।

'কারণ সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি শক্তিশালী। পৃথিবীতে যার ওজন ১৭০ পাউন্ড, সূর্যে তার ওজন হবে সাড়ে চার হাজার পাউন্ডেরও বেশি। কাজেই কপিকল ছাড়া সেখানে খাড়া হয়ে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে ওঁরা টের পেলেন, উদাসীন অঞ্চল পেরিয়ে যাচ্ছে প্রোজেক্টাইল। গোলার ভেতরকার সবকিছু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। এখন কোনকিছুই আর আগের মত শূন্যে ভেসে থাকছে না। যে সমস্ত জিনিসগুলোকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা হয়েছিল, সেগুলোও একসময় বন্দী গোলার মেঝে স্পর্শ করল। বেচারী নেপচুন অনেকক্ষণ শূন্যবন্দী থাকার পর একছুটে গিয়ে ঢুকল ডিভানের নিচে। ভাবখানা এই, যদি কেউ তাকে আবার ধরে নিয়ে গিয়ে শূন্যে আটকে

ফেলে! তাই সময় থাকতে পালিয়ে বাঁচো।

একটু একটু করে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতায় ঢুকে যাচ্ছে প্রোজেক্টাইল।

বিশ

এবার শুরু হল চাঁদে নামার প্রস্তুতি। যদিও চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর চাইতে অনেক কম, তবু পঁচিশ হাজার মাইল ওপর থেকে আছড়ে পড়লে গুঁড়ো হয়ে যাবে প্রোজেক্টাইল। এ থেকে রক্ষা পেতে হলে গোলার গতিবেগকে সময়মত রুখে দিতে হবে। এর জন্যে রয়েছে কিছু শক্তিশালী হাউই। প্রয়োজনের সময় হাউইগুলোকে বিস্ফোরিত করে গতিবেগ কমিয়ে আনতে হবে। এছাড়া অবতরণের সময় অভিযাত্রীরা যাতে প্রচণ্ড ধাক্কার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেন, বার্বিকেন সে-ব্যবস্থাও করলেন।

যাত্রার শুরুতে ধাক্কা সামলানর জন্যে যে কাঠের চাকতিগুলোকে বার্বিকেন ব্যবহার করেছিলেন; সেগুলোকে আবার মেরামত করে কাজে লাগালেন তিনি। সব কয়টা চাকতিকে একের পর এক সাজিয়ে লোহার আংটা দিয়ে জুড়ে দেয়া হল। ওপরের চাকতিটায় রইল ওদের বসার আসন।

ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে গোলাটা। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করে নিকল আর বার্বিকেন দু'জনেরই মনে খটকা লাগল। প্রোজেক্টাইল চাঁদের কেন্দ্র লক্ষ্য করে ছুটছে না–চলার গতিটা যেন সামান্য বাঁকা!

কিন্তু তাই বা হয় কি করে!–মনে মনে ভাবলেন নিকল। বার্বিকেন বললেন, 'কেমব্রিজ মানমন্দিরের হিসেবমত সময় আর নিশানা ঠিক রেখেই আমরা যাত্রা শুরু করেছি। সুতরাং গতিপথে কোন হেরফের হয়েছে বলে মনে হয় না।'

'হতেও তো পারে! ওদের কথামত সেকেন্ডে বারো হাজার গজ গতিবেগে যাত্রা শুরু করার কথা ছিল আমাদের। যদি সত্যি সত্যিই ওই গতিবেগে যাত্রা শুরু করতাম, তাহলে কি হত অবস্থাটা–একবার ভেবে দেখুন তো?'

'না, মঁশিয়ে। অন্তত এই একটা ব্যাপারে ওরা কোন ভুল করেনি। ওদের পাঠানো চিঠিটা আমি কয়েকবার পড়ে দেখেছি–তথ্যে কোনরকম ভুল নেই।'

'সে যাই হোক, আমরা যে একটু বাঁকা পথে এগুচ্ছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' আর্দাঁ বললেন।

যে-কোন কারণেই হোক, প্রোজেক্টাইল ঠিকই একটু বাঁকা পথ ধরে এগুচ্ছে। নইলে চাঁদের মাঝামাঝি কোন এলাকার দৃশ্য এতক্ষণে ওঁরা দেখতে পেতেন। কিন্তু ওদের দূরবীনে চাঁদের উত্তর দিককার কিছু অংশ ধরা পড়ল।

গোলাটা চাঁদ থেকে এখনও কুড়ি হাজার মাইল দূরে। একটু কাত হয়ে চাঁদ লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা। প্রোজেক্টাইল যতই এগিয়ে যাচ্ছে, বার্বিকেনও মনে মনে ততই শঙ্কিত হয়ে উঠছেন–গোলাটা শেষে না জানি আবার মহাশূন্যেই মিলিয়ে

যায়! আর্দাঁর চোখে মুখেও দুশ্চিন্তার ছায়া। কিন্তু নিকল এখনও আশাবাদী। তাঁর ধারণা, গোলাটা চাঁদেই পৌঁছবে–তা সেটা কেন্দ্রে কিংবা উত্তর দক্ষিণ যেখানেই হোক না কেন।

হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে চেঁচিয়ে উঠলেন বার্বিকেন, 'পেয়ে গেছি! গোলার বাঁকা পথে চলার কারণ খুঁজে পেয়েছি।'

'তা সেই কারণটা কি, বলুন না!' প্রায় একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন নিকল আর আর্দাঁ। উত্তেজনায় ওদের ফর্সা চেহারা লাল হয়ে উঠেছে।

'সেই উল্কাটাই এই অঘটনের মূল। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় উল্কার টানেই প্রোজেক্টাইল তার গতিপথ থেকে সামান্য সরে গিয়েছিল। আয়তনে উল্কাটা ছিল অনেক বড়; আর মহাশূন্যের নিয়মই হল, বড় জিনিস সবসময় ছোট জিনিসকে আকর্ষণ করে।'

'কিন্তু গতিপথে যদি সামান্য হেরফের হয়েও থাকে তো তাতে এমন কি-ই বা ক্ষতি?' বললেন আর্দাঁ।

'গোলাটা যখন উল্কার পাল্লায় পড়েছিল, চাঁদ তখনও দু'লাখ মাইল দূরে। যদি উল্কার টানে প্রোজেক্টাইল একচুলও নড়ে গিয়ে থাকে তাহলে চাঁদে নামা তো হবেই না বরং আমাদের অসীম মহাশূন্যে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি।'

'এখন তাহলে উপায়?' আর্দাঁর কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

'নিজেদেরকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোন পথ আমাদের সামনে খোলা নেই,' হতাশার সুর বেজে উঠল বার্বিকেনের কণ্ঠে।

রাত বারোটা নাগাদ চাঁদের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছল গোলাটা। শেষ পর্যন্ত গোলাটা চাঁদে গিয়ে পৌঁছবে, নাকি মহাশূন্যে হারিয়ে যাবে তা এ মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কারণ চাঁদ থেকে প্রোজেক্টাইল এখনও সাড়ে সাতশো মাইল দূরে।

চাঁদের বুকে যে সমস্ত গুহা-গহ্বর আর চড়াই-উৎরাই এতদিন ধরে বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যময় ছিল, আজ অভিযাত্রীরা খুব কাছে থেকে সেগুলো দেখার সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

বার্বিকেনের হাতে বোর এবং মিলারের বিখ্যাত 'ম্যাপ সেলোনোগ্রাফিকা'–চাঁদের ম্যাপ। সেটা মেলে ধরলেন তিনি। গোলাটা চাঁদের যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে এখন ছুটে চলেছে সেই এলাকার সমস্ত কিছুর ধারা বিবরণী দিয়ে চললেন বার্বিকেন।

'ওই যে, নিচে তাকিয়ে দেখুন; বিরাট খাদের মত দেখতে ওটার নাম মেঘ-সমুদ্র। একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী অবশ্য বলেছিলেন, মেঘটেঘ কিছু নয়–খাদের নিচে চকচকে বালু রয়েছে। যখন সূর্যের আলো ওই বালুর ওপর পড়ে তখন অদ্ভুত এক প্রতিফলনের সৃষ্টি হয়। আর সেজন্যেই খাদটাকে দূর থেকে মেঘের মত ঘোলাটে দেখায়। অনেক জ্যোতির্বিদের ধারণা, মেঘ-সমুদ্রের তলায় গাদা গাদা লাভা জমে রয়েছে। কারণ পাশেই আছে বড় বড় কয়েকটা আগ্নেয়গিরি। অবশ্য সেগুলো থেকে এখন আর লাভা বোরোয় না।'

মেঘ-সমুদ্র ছাড়িয়ে আরও উত্তর দিকে এগিয়ে গেল প্রোজেক্টাইল। একটু পরে

বিরাট একটা পাহাড় নজরে পড়ল ওঁদের। সূর্যের আলোয় যেন জ্বল জ্বল করছে পাহাড়ের চুড়ো। 'এ পাহাড়ের নামটা যেন কি?' আর্দা জিজ্ঞেস করলেন।

'কোপার্নিকাস,' ম্যাপের দিকে চোখ রেখে বললেন বার্বিকেন, 'ম্যাপে লেখা রয়েছে, পাহাড়টার উচ্চতা নাকি সাড়ে দশ হাজার ফুট।'

এতক্ষণ দূর থেকে কোপার্নিকাসকে দেখছিলেন ওঁরা; কিন্তু এখন পাহাড়টার খুব কাছাকাছি চলে এল প্রোজেক্টাইল। ওপর থেকে পাহাড়ের চুড়োটাকে দূরবীন দিয়ে স্পষ্ট দেখা গেল। কোপার্নিকাস একসময় যে আগ্নেয়গিরি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাহাড়ের পাদদেশ ঘেঁষে জমে থাকা লাভার স্তূপ দেখে সহজেই তা অনুমান করা যায়।

কোপার্নিকাসের চুড়ো পেছনে পড়ে রইল–গোলাটা ছুটে চলল ঝড়ের গতিতে। এবারে প্রায় ন'হাজার ফুট উঁচু একটা পাহাড় নজরে পড়ল ওঁদের। পাহাড়ের পাদদেশ ঘেঁষে বিরাট জ্বালামুখের মত একটা গর্ত দেখতে পেলেন ওঁরা। ম্যাপের লেখা পড়ে বার্বিকেন বললেন, 'পাহাড়টার নাম ইরাটোসথেন্স। আর ওই যে জ্বালামুখের মত গর্ত দেখছেন, কেপলারের মতে গর্তটা নাকি চাঁদের মানুষেরাই খুঁড়েছে।

'কেন?' নিকল জিজ্ঞেস করলেন।

'সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্যে। কারণ পৃথিবীর হিসেবে প্রায় পনেরো দিনে ওদের দিন-রাত। কাজেই একটানা রোদের হাত থেকে বাঁচতে হলে এছাড়া অন্য কোন উপায় বোধহয় ওদের জানা নেই।'

'তাহলে তো দেখছি চাঁদের মানুষেরা মাথায় বেশ ঘিলু রাখে!' কৌতুকের সুরে মন্তব্য করলেন আর্দা।

'কেপলার যাই বলে থাকুক না কেন, আমার কি মনে হয় জানেন, মঁশিয়ে?'

'কি?'

'গর্তটা আসলে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ,' বললেন বার্বিকেন। 'কারণ খুদে চন্দ্র-মানবদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয় ওই রকম প্রকাণ্ড একটা গর্ত খোঁড়া।'

'চাঁদের মানুষেরা আকারে ছোট হতে পারে; কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, সেখানকার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ। সুতরাং অল্প শক্তি খরচ করেই খুদে চন্দ্র-মানবদের পক্ষে এত বড় গর্ত খোঁড়া সম্ভব,' বললেন নিকল।

'নাহয় ধরেই নিলাম আপনার কথা ঠিক; কিন্তু চাঁদে পৌঁছে যদি দেখি চন্দ্র-মানব বলে কিছু নেই–তখন?'

'গোলাটা আগে চাঁদে নামুক–অবশ্য আদৌ চাঁদে নামবে কিনা সন্দেহ–তারপর এ ব্যাপারে নতুন আর একটা বাজি ধরব। কি, রাজি?'

'একশোবার,' বার্বিকেনও দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলেন।

একুশ

পৃথিবীর হিসেবমত এখন রাত আড়াইটা। গোলাটা চাঁদের পাঁচশো মাইল ওপর দিয়ে

ছুটে যাচ্ছে। একটা কথা ভেবে বার্বিকেন মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়ছেন; গোলার গতিবেগে কোন হেরফের হচ্ছে না। কিন্তু কেন? স্বাভাবিক নিয়মে গোলার গতিবেগ অবশ্যই বেড়ে যাওয়া উচিত ছিল। সমস্যাটা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামানর সুযোগ পেলেন না তিনি। চাঁদের আশ্চর্য রূপ-সুষমা আবারও দৃষ্টি কেড়ে নিল তাঁর। একটা জিনিস লক্ষ করে বেশ অবাকই হলেন তিনি। যে সমস্ত আগ্নেয়গিরি এ যাবৎ তাঁদের নজরে পড়েছে, সেগুলোর জ্বালামুখে যেন রংধনুর খেলা। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ এবং আরও অনেক রংয়ের আভা যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে সেসব জ্বালামুখ থেকে।

জানালা দিয়ে তাকিয়েছিলেন আর্দাঁও। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'বার্বিকেন,ওই দেখুন; লাঙল চষা জমির মত মনে হচ্ছে। আসলে ওগুলো কি?'

'ভূমিকম্পের ফলে মাটি ফেটে গিয়ে ওরকম হয়েছে। একেকটা ফাটল লম্বায় প্রায় দেড় হাজার মাইল আর চওড়ায় আধ মাইলের মত,' দূরবীন দিয়ে ফাটলগুলো ভাল করে দেখলেন বার্বিকেন।

ওগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিখার মত মনে হল তাঁর কাছে।

চল্লিশ ডিগ্রী চন্দ্র অক্ষাংশ বরাবর ছুটে যাচ্ছে প্রোজেক্টাইল। চাঁদের পিঠ থেকে গোলাটা এখনও চারশো মাইল ওপরে। বিরাট ফাটলগুলো ধীরে ধীরে ওদের দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। এক সময় সেগুলো একেবারে মিলিয়ে গেল। এবারে ওদের নজরে পড়ল মাউন্ট হ্যালিকন। দেড় হাজার ফুট উঁচু। প্রকাণ্ড জ্বালামুখ দেখে সহজেই আন্দাজ করা যায়–মাউন্ট হ্যালিকন এক সময় জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ছিল। এর বাঁ দিকে বর্ষা-সমুদ্র। নামে সমুদ্র হলেও আসলে তা শুকনো খটখটে খাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

চাঁদে প্রাণী আছে কিনা এ ব্যাপারে সবাই খানিকটা সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। কারণ দূরবীন চোখে দিয়ে এ পর্যন্ত যা কিছু দেখতে পাওয়া গেল তার সবই নিষ্প্রাণ, নির্জীব। বার্বিকেন মনে মনে একরকম ধরেই নিলেন, চাঁদে কোন প্রাণী নেই–মানুষ তো দূরের কথা! আর্দাঁ অবশ্য অন্য কথা বলছেন। তাঁর মতে, চাঁদে শুধু প্রাণী নয়, মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবও রয়েছে। সূর্যের উত্তাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্যে গর্তে লুকিয়ে রয়েছে তারা।

ভোর পাঁচটা। বর্ষা-সমুদ্র পেরিয়ে কৃষ্ণ-সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলল গোলাটা। পাশেই বিরাট একটা জ্বালামুখ দেখা যাচ্ছে। প্লুটো নামের এই জ্বালামুখটা লম্বায় চল্লিশ আর চওড়ায় প্রায় ত্রিশ মাইল। প্রোজেক্টাইল আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই একসঙ্গে অনেকগুলো ছোট-বড় পাহাড় দেখতে পেলেন ওঁরা। ওগুলোর মধ্যে কেবল কোনডামাইন আর ফনটেনেলিকে ম্যাপ দেখে চিনতে পারা গেল। আরও খানিকক্ষণ পরে ওঁরা দেখতে পেলেন, প্রকাণ্ড ফিলোল্স পাহাড়। এর চূড়োর উচ্চতাই প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট। সূর্যের উজ্জ্বল আলোতে চূড়োটাকে মনে হচ্ছে যেন বিরাট এক লাইট হাউস।

প্রোজেক্টাইল এখন আশি ডিগ্রী চন্দ্র অক্ষাংশ বরাবর ছুটে চলেছে। চাঁদের পিঠ থেকে গোলাটা এখন মাত্র পঞ্চাশ মাইল ওপরে। কিন্তু দূরবীন চোখে দিয়ে মনে হয়, বিরাট বিরাট পাহাড়গুলোকে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

চাঁদের উত্তর মেরু যখন ওদের দৃষ্টি সীমানায় ধরা দিল, ঘড়িতে তখন সকাল

ছ'টা। আর্দা মনে মনে এখনও আশাবাদী–গোলাটা শেষ পর্যন্ত হয়ত উত্তর মেরুতেই নামবে। কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। মেরু অঞ্চল পেরুলেই অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করবে প্রোজেক্টাইল।

হঠাৎ করেই সূর্যটা হারিয়ে গেল। মহাশূন্যের আলো ঝলমলে উজ্জ্বলতাকে কোন এক দানবিক শক্তি যেন থাবা মেরে কেড়ে নিল। আলোর রাজের শেষ সীমানা ছাড়িয়ে গোলাটা এবার অন্ধকার এলাকার ওপর দিয়ে উড়ে চলল।

পৃথিবীর হিসেবে চাঁদের যে এলাকায় পনেরো দিন রাত, প্রোজেক্টাইল এবার সেই অঞ্চলের ওপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল। একটু পরেই শুরু হল হাড় কাঁপানো শীত। পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের শীতও যেন এর কাছে হার মানে। গ্যাসের চুলো জ্বেলেও ঠাণ্ডাকে তেমন একটা বাগে আনা যাচ্ছে না। বার্বিকেন ব্যারোমিটারে দেখলেন, আগুন জ্বালানর পরেও তাপমাত্রা শূন্য তাপাঙ্কের সতেরো ডিগ্রী নিচে। নিকল বললেন, 'গোলার ভেতরেই যদি এ অবস্থা হয় তাহলে বাইরের তাপমাত্রা কত কে জানে!'

'দাঁড়ান, বাইরের তাপমাত্রাও এক্ষুণি মেপে দেখছি,' বলে পকেট থেকে একটা স্পিরিট ব্যারোমিটার বের করলেন বার্বিকেন। ব্যারোমিটারে পারদ থাকলে তা শূন্য তাপাঙ্কের ঊনচল্লিশ ডিগ্রীতে গিয়ে জমে শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু স্পিরিট ব্যারোমিটারে সে-ঝামেলা নেই। বার্বিকেন একটা সুতোর সঙ্গে ব্যারোমিটারটা বাঁধলেন। সুতোসহ সেটা জানালা দিয়ে বাইরে গলিয়ে দেয়া হবে। সুতোর অন্য প্রান্তটা থাকবে তাঁর হাতে।

বার্বিকেনের বুদ্ধিটা আর্দার বেশি পছন্দ হল না। তিনি বললেন, 'অত ঝামেলার দরকার কি? তাছাড়া গোলার সঙ্গে বাড়ি লেগে ভেঙেও তো যেতে পারে! এর চাইতে জানালাটা খুলে ব্যারোমিটারটাকে কয়েক সেকেন্ড হাতে ধরে রাখলে হয় না?'

'এই ঠাণ্ডায় শ্বেত ভল্লুকও জমে যায়; আর আপনি কিনা বলছেন জানালা দিয়ে বাইরে হাত রাখবেন। একবার চেষ্টা করেই দেখুন না! কাঁধ থেকে গোটা হাতটাই খসে পড়বে।'

ঝট করে জানালা খুলে ব্যারোমিটারটা বাইরে ছুঁড়ে দিলেন বার্বিকেন; কয়েক সেকেন্ড পরে সেটা টেনে তুললেন আবার। দেখা গেল, তাপমাত্রা শূন্য তাপাঙ্কের একশো চল্লিশ ডিগ্রী নিচে। জানালা খোলা এবং বন্ধ করার ফাঁকে বাইরের ঠাণ্ডা গোলার ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। সেই ঠাণ্ডায় শুধু ওঁরা কেন, কুকুর নেপচুনও বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

ঘড়ির সময় অনুযায়ী এখন সকাল আটটা। সুতরাং আর দেরি না করে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করতে লেগে গেলেন আর্দা।

পরের দিন। ঘড়ির হিসেবমত এখন সকাল। এর আগের দিনটা ওঁদের কেটেছে শুধু খাওয়া-দাওয়া, গাল-গল্প আর ঘুমানর মধ্য দিয়ে।

অন্ধকারের রাজ্য এখনও পেরোয়নি প্রোজেক্টটাইল। গোলার জানালা দিয়ে বাইরে চাইলে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। গোলাটা যখন আলোর এলাকা দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, তখন অভিযাত্রীদের সময় কেটেছিল আনন্দের মধ্যে

দিয়ে। আর এখন একেকটা মুহূর্তকে মনে হচ্ছে যেন একেকটা ঘণ্টা! ধীরে ধীরে ওদেরকে একঘেয়েমিতে পেয়ে বসছে। একঘেয়ে নীরবতা ভেঙে আর্দাঁ মুখ খুললেন, 'শেষ পর্যন্ত চাঁদে নামব তো, বার্বিকেন?'

'চাঁদে নামার জন্যে যে সময়টা নির্দিষ্ট ছিল তা অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। আর হ্যাঁ, গোলাটা নামতে নামতে অনেকক্ষণ আগে পঁচিশ মাইলে এসে ঠেকেছে। এরপর আর নামার কোন লক্ষণই দেখছি না। সেজন্যেই মনে হচ্ছে, গোলাটা চাঁদে না নেমে এভাবেই হয়ত ঘুরতে থাকবে চিরকাল।'

সকাল আটটার দিকে হঠাৎ একটা ডিগবাজি খেল গোলাটা। এর একটু পরে বার্বিকেন আবিষ্কার করলেন, গোলার চ্যাপ্টা দিকটা চাঁদের দিকে মুখ করে রয়েছে। ভারি জিনিস ওপর থেকে নিচে পড়ার সময় যা হয়, প্রোজেক্টাইলেরও তাই হয়েছে। একটু আশার আলো উঁকি দিল তাঁর মনে। তাহলে গোলাটা এবার চাঁদে নামতে চলল? কিন্তু না; কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর বার্বিকেন দেখলেন, গোলাটা যে উচ্চতায় ছিল তা থেকে এক মাইলও নিচে নামেনি।

প্রোজেক্টাইল ছুটছে তো ছুটছেই। এ ছোটার যেন শেষ নেই। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু এই অন্ধকারের বুক চিরে হঠাৎ একটা উজ্জ্বল লাল বিন্দু ওদের দৃষ্টি কেড়ে নিল। গোলাটা আর একটু এগিয়ে যেতেই 'আগ্নেয়গিরি', 'আগ্নেয়গিরি' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন নিকল। সত্যিই তাই। বিন্দুটা ঠিকই একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। জ্বালামুখ দিয়ে যেন আগুনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এই-ই প্রথম জীবন্ত আগ্নেয়গিরির দেখা পেলেন ওঁরা। আর্দাঁ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তাহলে নিশ্চয়ই চাঁদে বাতাস আছে; নইলে আগুন জ্বলছে কেমন করে?'

'আগ্নেয়গিরির ভেতরে রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্যে আপনাআপনিই অক্সিজেন তৈরি হয়। আর সেজন্যেই লাভা বেরিয়ে আসার সময় জ্বলতে জ্বলতে বেরোয়। সুতরাং, চাঁদে বাতাস আছে, একথা কি জোর দিয়ে বলা যায়?' বার্বিকেন বললেন।

আর্দাঁ বোধহয় আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল তাঁর। হঠাৎ আলোর বন্যায় যেন ভেসে গেল গোলার ভেতরটা। তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল সবার। প্রথমে কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না। চোখ কচলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন সবাই। একটা জ্বলজ্বলে কি যেন ওদের দিকেই ছুটে আসছে। আকারে ছোট হলেও জিনিসটা দেখতে ঠিক চাঁদের মত। 'বাহ! এ যে দেখছি চাঁদেরও চাঁদ!' আর্দাঁর কণ্ঠে খুশি খুশি ভাব।

'এতে খুশি হবার কিছু নেই। জিনিসটা একটা উল্কা, আর ছুটে আসছে আমাদেরই দিকে,' বার্বিকেনের কথায় চোখ বড় বড় হয়ে গেল আর্দাঁর।

যাত্রার শুরুতেও একবার এ রকমটা হয়েছিল। উল্কার সঙ্গে সংঘর্ষ হতে হতেও সেবার বেঁচে গিয়েছিল প্রোজেক্টাইল। কিন্তু এবার বুঝি আর রক্ষা নেই! অগ্নিকুণ্ডের মত জ্বলজ্বলে উল্কাটা গোলা লক্ষ্য করেই যেন ছুটে আসছে। মনে মনে প্রমাদ গুণলেন সবাই। বার্বিকেন আন্দাজ করলেন, উল্কাটার ব্যাস কম করে হলেও দেড়মাইল হবে। সময় যতই পেরিয়ে যাচ্ছে, উল্কাটাও গোলার ততই কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। সংঘর্ষ এই লাগল বলে! ভয়ে কারও মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুচ্ছে না। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই প্রচণ্ড সংঘর্ষে ছাতু হয়ে যাবে

প্রোজেক্টাইল! কিন্তু ঈশ্বর যাদের সহায় তাদের ধ্বংস এত সহজে হয় না।

হঠাৎ করেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। প্রোজেক্টাইলের খুব কাছে এসে বিস্ফোরিত হল উল্কাটা। রক্ষা যে, চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই। নইলে এত বড় বিস্ফোরণের শব্দে হয়ত কানের পর্দাই ফেটে যেত ওদের। প্রায় অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেন অভিযাত্রীরা।

খুশির চোটে বাচ্চা ছেলের মত লাফাতে লাগলেন আর্দাঁ। নিকলও ওঁর সাথে যোগ দিলেন। ছুটে গিয়ে কোত্থেকে যেন দামি এক বোতল শ্যাম্পেন বের করে আনলেন আর্দাঁ। গ্লাসে ঢালতে গিয়ে বাধা পেলেন বার্বিকেনের কাছে। ওঁদের দুজনকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে বললেন তিনি।

ওঁরা যা দেখতে পেলেন তা ভাষায় বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। উল্কাটা ফেটে গিয়ে হাজারটা টুকরোয় চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যেন হাজার হাজার আতশবাজি জ্বেলে দিয়েছে কেউ। কোনটার রং লাল, কোনটার নীল কিংবা সবুজ। বেগুণী আর হলুদ রংয়ের কয়েকটা টকুরোও দেখা গেল। কয়েকটা টুকরো জ্বলতে জ্বলতে গোলার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এতে একটা কাঁচ সামান্য ফেটে গেল। এছাড়া গোলার তেমন কোন ক্ষতি হল না।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও চাঁদের অন্ধকার দিকটা যেন আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল। আর এই সুযোগে অভিযাত্রীরা দেখে নিলেন চাঁদের অজানা অঞ্চল। যা এর আগে কেউ দেখতে পায়নি। দূর থেকে ওদের নজরে পড়ল, লম্বা সারিসারি ফাটল, ছোট বড় পাহাড়, বড় বড় জ্বালামুখ, প্রকাণ্ড একেকটা খাদ। আলোকিত অঞ্চলের সঙ্গে অন্ধকার অঞ্চলের তেমন কোন পার্থক্য নজরে পড়ল না ওঁদের। কিন্তু দূরে ওটা কি? ঠিক যেন গহীন অরণ্য! বার্বিকেন দূরবীন দিয়ে ভাল করে দেখার আগেই পেছনে মিলিয়ে গেল সেটা। মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন সবাই। চাঁদের বুকে এরকম জঙ্গল থেকে থাকলে জীবনের সন্ধানও সেখানে পাওয়া যাবে। কিন্তু ওঁরা যা দেখলেন, তা কি সত্যিই জঙ্গল, নাকি মেঘ-সমুদ্রের মত ধোঁয়াটে কোন কিছুকেই জঙ্গল বলে ভুল করেছেন ওঁরা। যাচাই করার ফুরসত মিলল না। গোলাটা এখন আবার অন্ধকার চিরে ছুটে যাচ্ছে।

উল্কার খপ্পর থেকে রক্ষা পেয়ে অভিযাত্রীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এ নিয়ে দু'বার উল্কার সঙ্গে সংঘর্ষ হতে হতেও বেঁচে গেলেন ওঁরা। যাত্রার শুরুতেও একবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন সবাই। এবারেও সবার নাভিশ্বাস উঠিয়ে ছেড়েছিল উল্কাটা। কিন্তু এজন্যে কারুর মনে এতটুকুও দুঃখ নেই। উল্কাটা যদি ফেটে চৌচির না হত, তাহলে চাঁদের অন্ধকার দিকটাও ওরা দেখতে পেতেন না–বিজ্ঞানীদের কাছে আজ পর্যন্ত যা বিরাট এক রহস্য তা শেষ পর্যন্ত রহস্যই রয়ে যেত।

বিকেল পাঁচটার দিকে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেন সবাই। কিছুক্ষণ আগেও চাঁদের অন্ধকার এলাকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ব্যস্ত ছিলেন ওঁরা। এর খানিকক্ষণ আগে উল্কাটাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল ওঁদের। তাই দুপুরের খাওয়া সারতে সারতে প্রায় বিকেল গড়িয়ে গেল। আজকের মেনু ছিল মাংস, রুটি আর চা। তা-ই ওঁরা তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন।

খেয়ে দেয়ে একটু আয়েশ করা আর হয়ে উঠল না ওঁদের। গোলার জানালা দিয়ে ওঁরা দেখতে পেলেন, চাঁদের বুকের অন্ধকার ধীরে ধীরে যেন ফিকে হয়ে আসছে! চোখ কচলে নিয়ে দূরবীন চোখে বাইরে তাকালেন বার্বিকেন। সত্যিই তাই। ভোর বেলায় সূর্য ওঠার আগে অন্ধকারটা যেমন পাতলা হয়ে আসে, চাঁদের বুক থেকেও অন্ধকার যেন ঠিক তেমনি ফিকে হয়ে আসছে। দুরে দেখা গেল, কয়েকটা উজ্জ্বল বিন্দুর মত কি যেন।

'কি ওগুলো?'

'সূর্যের আলো।'

'বলেন কি!' বার্বিকেনের কথায় আর্দাঁ বেশ অবাকই হলেন।

'হ্যাঁ। বহুদূরের কয়েকটা পাহাড়ের চুড়োয় সূর্যের আলো পড়ে অমনটা দেখাচ্ছে। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদের আলোকিত অঞ্চলের ওপর দিয়ে আবার উড়ে যাবে পোজেক্টাইল।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না; হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে তীব্র আলোর দ্যুতি গোলাটাকে যেন ঝলসে দিল। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন আর্দাঁ, 'তাহলে কি দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে গেছি আমরা?'

'হ্যাঁ। আমরা এখন ডিমের মত কক্ষপথ ধরে কেবল ঘুরতেই থাকব। সোজা কথায় পোজেক্টাইল এখন চাঁদের উপগ্রহ হয়ে গেছে।'

বাইশ

ভোর ছ'টা। লম্বা ঘুমের পর জেগে উঠলেন অভিযাত্রীরা। গোলাটা এখন দক্ষিণ মেরু ছেড়ে আরও সামনের দিকে উড়ে যাচ্ছে। সূর্যের আলোয় গোলার ভেতরটা গরম হয়ে উঠেছে। নিকল উঠে গিয়ে গ্যাসের চুলো নিভিয়ে দিলেন। সূর্যের উত্তাপ রয়েছে, তাই অনর্থক আগুন জ্বেলে রাখার কোন প্রয়োজন নেই।

দূরবীন চোখে দিয়ে বাইরে তাকালেন সবাই। উজ্জ্বল আলোয় ডোরফেল আর লিবনিজ পাহাড়ের চুড়ো ঝলমল করছে। বাইরে তাকানর ফাঁকে ফাঁকে ম্যাপের ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন বার্বিকেন। একটু পরেই সাদা সাদা কি যেন দেখা গেল। জ্বালামুখ আর মাটির ফাঁকে ফোকরে থেকে থেকে যেন উঁকি দিচ্ছে সেগুলো। সূর্যের আলো সেগুলোর ওপর পড়ে এক চোখ ধাঁধানো পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। 'তুষার', 'তুষার' বলে চিৎকার করে উঠলেন বার্বিকেন।

'তুষার? বলছেন কি!' নিকলের কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময়।

'হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। ওগুলো তুষার ছাড়া আর কিছু নয়। বিজ্ঞানীরা আগেই এরকম একটা ধারণা করেছিলেন–দক্ষিণ মেরুর এই দিকটাতে হয়ত বরফ রয়েছে।'

বরফ থাকলে পানিও আছে। আর পানি থেকে থাকলে বাতাস তো থাকবেই। আর বাতাস থাকলে সেখানে জীবনের সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ। কিন্তু ওঁরা এ

পর্যন্ত যা দেখলেন তাতে জীবনের চিহ্নমাত্রও কোথাও পাওয়া যায়নি। তাহলে ফাঁকে ফোকরে জমে থাকা ওগুলো তুষার, নাকি অন্য কিছু? অভিযাত্রীরা চাঁদে নামতে পারলে হয়ত বা প্রশ্নের জবাব মিলতে পারে।

এবার ওঁদের নজরে পড়ল মাউন্ট নিউটন। বিরাট জ্বালামুখ নিউটনের। পাহাড়টা কম করে হলেও বাইশ হাজার ফুট উঁচু। এরপর ওঁরা মাউন্ট ক্লেভিয়াসকে দেখতে পেলেন। নিউটনের চাইতে এর জ্বালামুখটা কয়েকগুণ বড়। বার্বিকেন বললেন, 'গোটা পঞ্চাশেক বিসুভিয়াস কিংবা অন্য কোন আগ্নেয়গিরি খুব সহজেই এগুলোর জ্বালামুখ দিয়ে ঢুকে যাবে।'

'কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে,' আর্দাঁ বলতে লাগলেন, 'একদিন এগুলোর সবকয়টা দিয়েই লাভা বেরুত। একবার ভেবে দেখুন, একসঙ্গে হাজারটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে লাভার স্রোত বেরিয়ে আসছে! উল্কার মত একেকটা আগুনের টুকরো চারদিকে বৃষ্টির মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে! প্রচণ্ড কম্পনে চাঁদের মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে! আর আজ? যে চাঁদকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা তো চাঁদ নয়–চাঁদের প্রেতাত্মা!'

ডেনিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহির নামের সঙ্গে মিল রেখে আগ্নেয়গিরিটার নাম রাখা হয়েছিল টাইকো। জানালা দিয়ে চেয়ে এবার টাইকোকে দেখতে পেলেন ওঁরা। আগ্নেয়গিরির সারি থেকে টাইকোকে সহজেই চেনা যায়–গা দিয়ে যেন দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে টাইকোর। পৃথিবীতে বসে মাঝারি পাল্লার দূরবীন দিয়েও নাকি পাহাড়টাকে চেনা যায়। টাইকোর গা লেপ্টে কি কি খনিজ পদার্থ রয়েছে তা জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা কম চেষ্টা করেননি। কিন্তু কোন সমাধানে আসতে পারেননি তাঁরা। টাইকোর অতিরিক্ত উজ্জ্বল আলোর ছটায় বার্বিকেনদের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। ওঁরা তাই দূরবীনে খানিকটা ধুলো মাখিয়ে নিলেন। বার্বিকেন হিসেব করে দেখলেন আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখটার ব্যাসই হবে প্রায় পঞ্চাশ মাইল। পূর্ণিমার সময় টাইকোর চেহারা রাতারাতি পাল্টে যায়। শুধু চুড়োই নয়, গোটা পাদদেশ জুড়ে শুরু হয় রঙের খেলা। জমে থাকা লাভার ওপর যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন মনে হয়, হাজারটা রঙধনু টাইকোকে যেন ঘিরে ধরেছে।

শুধু টাইকোর গা থেকেই নয়। জ্বালামুখের ধারেকাছে বেশ কিছু লম্বা আলোকরশ্মি চোখে পড়ল ওঁদের। একেকটা আলোকরশ্মি দশ থেকে বারো মাইল পর্যন্ত লম্বা। দূর থেকে ওগুলোকে দেখে মনে হয় যেন ফসফরাস কিংবা ওই জাতীয় কোন পদার্থের স্তূপ। কিন্তু ওগুলো আসলে যে কি, ওঁদের কাছে তা একেবারেই অজানা। বিজ্ঞানী হার্সেল অবশ্য বলেছিলেন, লাভার স্রোত প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে এমনটা হয়েছে। বার্বিকেন এ কথা মানতে রাজি নন। তাঁর যুক্তি হল, লাভার স্রোত কখনই এমন নিখুঁত ভাবে ধেয়ে চলে না। আলোর রশ্মিগুলো যদি ঠাণ্ডায় জমা লাভাস্রোত হত তাহলে তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। আর্দাঁ ঠাট্টার সুরে বলে উঠলেন, 'লাভা-টাভা কিছু নয়; আসলে প্রকাণ্ড একটা উল্কা আছড়ে পড়েছিল চাঁদের বুকে। আর তারই আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে আজও,' এ কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

কথায় কথায় পুরানো তর্কে নেমে গেলেন ওরা। 'আমরা চাঁদের খুব কাছ

থেকেও প্রাণের কোন সন্ধান পাইনি,' বললেন বার্বিকেন।

'প্রত্যক্ষভাবে না পেলেও পরোক্ষভাবে পেয়েছি বৈকি! চাঁদে আমরা জঙ্গল দেখতে পেয়েছি।'

'সেটা সত্যিই জঙ্গল কিনা সে ব্যাপারে আমরা এখনও তেমন নিশ্চিত হতে পারিনি,' আর্দাঁর কথার উত্তরে বার্বিকেন বললেন। নিকলও বার্বিকেনকে সমর্থন করলেন।

'কিন্তু চাঁদের বুকে আমরা বরফও দেখতে পেয়েছি।'

'ওগুলো আসলে বরফ, নাকি অন্য কিছু–আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী সে রহস্যের সমাধান খুঁজে পাননি। কাজেই এ ব্যাপারে চট্ করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আমাদের উচিত হবে না। যাক সে কথা; উল্কাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হবার সময় আমরা কোন শব্দ শুনতে পাইনি। এর অর্থ দাঁড়ায়–চাঁদে বাতাস নেই। যদি তাই হয়, তাহলে প্রাণীও নেই সেখানে।'

'ঠিক আছে। আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু অতীতে কি চাঁদের বুকে প্রাণী বাস করত?' আর্দাঁ জিজ্ঞেস করলেন।

'অনেকেরই ধারণা, অতীতের কোন এক সময়ে চাঁদে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। আমাদের মত সুসভ্য প্রাণীও নাকি বাস করত সেখানে।'

'তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই–চাঁদে সভ্যতা শুরু এবং শেষ, দুটোই হয়েছে আগে। তবে কি পৃথিবীর চাইতে চাঁদের বয়স বেশি?' নিকল জিজ্ঞেস করলেন।

'তা কেন হবে!' বার্বিকেন বলতে লাগলেন, 'প্রথম অবস্থায় দুটোই ছিল জ্বলন্ত গ্যাসের আধার। চাঁদের আয়তন ছোট। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই প্রথমে চাঁদ এবং পরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়েছে। যেহেতু চাঁদ ঠাণ্ডা হয়েছে পৃথিবীর আগে, তাই ধরে নেয়া হয়, সেখানে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে পৃথিবীর অনেক আগেই। অবশ্য এ সবই বিজ্ঞানীদের জল্পনা-কল্পনা; সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ কেউ হাজির করতে পারেননি।'

'আচ্ছা, চাঁদের সভ্যতা ধ্বংস হবার জন্যে দায়ী কি শুধু আগ্নেয়গিরি, নাকি অন্য কিছু?' জিজ্ঞেস করলেন আর্দাঁ।

'এর পেছনে আগ্নেয়গিরির কোন অবদান নেই। চাঁদের ভেতরটা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হবার ফলেই এমনটা হয়েছে।'

'কেবল ভেতর থেকে ঠাণ্ডা হবার জন্যেই কি গোটা প্রাণীজগৎ ধ্বংস হয়ে গেল?'

'মূল কারণ কিন্তু তাই। চাঁদের ভেতরকার উত্তাপ লোপ পেতেই উপরটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। গাছপালা মরে সাফ হয়েছে। বায়ুমণ্ডলও ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে গেছে। আর এসব কারণে প্রাণী জগৎও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'আমাদের পৃথিবীটাও কি একদিন এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে?'

'অবশ্যই। শুধু পৃথিবী কেন, সৌরজগতের সবকয়টা গ্রহেরই একই অবস্থা হবে। প্রতি একশো বছরে পৃথিবী যেটুকু তাপ হারাচ্ছে সেই হিসাবে এখনও এর আয়ু প্রায়...' বার্বিকেন মনে মনে হিসেব করতে লাগলেন।

বার্বিকেনের চুপ মেরে যাওয়াটা আর্দাঁর বেশি পছন্দ হল না। চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'কি; বলছেন না কেন, আমরা কত বছর বাঁচব?'

'হেসে ফেললেন বার্বিকেন। বললেন, "আমরা" না বলে বলুন পৃথিবী আর কত বছর বাঁচবে! হ্যাঁ; গাছপালা আর প্রাণীজগৎ পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে মুছে যেতে আরও চার লক্ষ বছর লাগবে।'

আড্ডা আর খোশগল্প আরও কতক্ষণ চলত বলা যায় না। কিন্তু হঠাৎ ছেদ পড়ল তাতে। বাইরের মহাকাশ আবারও কেড়ে নিল ওঁদের দৃষ্টি। একসঙ্গে সবাই জানালা দিয়ে বাইরে চাইলেন। একটা ব্যাপার লক্ষ করে ওরা সবাই অবাক হয়ে গেলেন। প্রোজেক্টাইল এখন আর ডিমের মত কক্ষপথ ধরে ঘুরছে না। বরং উদাসীন অঞ্চল ছেড়ে যে পথ দিয়ে চাঁদের কাছাকাছি এসেছিল, সেই পথ দিয়েই আবার ফিরে যাচ্ছে গোলাটা। হয়ত খুব শিগ্‌গিরই আবার উদাসীন অঞ্চলেই ফিরে যাবে।

আগ্নেয়গিরি, জ্বালামুখ, লম্বা একেকটা খাদ, আর বড় বড় ফাটলগুলো ওদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। এক সময় ওগুলো একেবারেই দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল। ঝড়ের বেগে ছুটে চলল প্রোজেক্টাইল।

তেইশ

'এখন দুটো ঘটনা ঘটতে পারে,' বার্বিকেন বললেন, 'উদাসীন অঞ্চলে পৌঁছে গোলাটা হয়ত ঠায় দাঁড়িয়ে যাবে; কারণ চাঁদ আর পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি সেখানে সমান।'

'অন্য সম্ভাবনাটা কি, শুনি?' নিকল জানতে চাইলেন।

'গতিবেগ যদি কমে গিয়ে না থাকে তাহলে উপবৃত্তের কক্ষপথ ধরে অনন্তকাল চাঁদটাকে চক্কর দিয়ে বেড়াবে প্রোজেক্টাইল।'

'শেষ পর্যন্ত বুঝি এই ছিল কপালে!' খেদের সঙ্গে বললেন আর্দাঁ।

'আচ্ছা, গোলার গতিবেগে কিছুটা হেরফের ঘটিয়ে প্রোজেক্টাইলকে অন্য পথে চালানো যায় না?'

নিকলের প্রশ্নের উত্তরে বার্বিকেন বললেন, 'গোলার গতিবেগের ওপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আর হ্যাঁ; ধরুন গতিপথ কোনভাবে পাল্টে দিয়ে অন্য পথে গোলাটাকে ঘুরিয়ে দেয়া হল–কিন্তু সেই "অন্য পথ'টা" আমাদের জানা দুটো পথের চাইতেও যদি খারাপ হয় তাহলে?'

'তাই বলে আমরা জেনেশুনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারি না! গতিপথ পরিবর্তনের ফলাফল যা-ই হোক না কেন, ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে।'

'কিন্তু গতিপথ পাল্টাবেন কি দিয়ে?'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলেছে,' এবারে আর্দাঁ বললেন, 'চাঁদে নামার জন্যে যে হাউইগুলো সঙ্গে এনেছিলাম, এবারে সেগুলোই ব্যবহার করব, গতিপথ পাল্টানোর কাজে।'

'সাব্বাস!' চেঁচিয়ে উঠলেন বার্বিকেন, 'হাউইগুলোর কথা একেবারে ভুলে

গিয়েছিলাম। ওগুলোই শেষ পর্যন্ত হয়ত বাঁচিয়ে দেবে আমাদের,' তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, 'রাত একটায় উদাসীন অঞ্চলে ঢুকবে প্রোজেক্টাইল। হাউইগুলোকে ছুঁড়তে হবে ঠিক ওই সময়েই।'

'হাতে এখনও যথেষ্ট সময় আছে,' বললেন আর্দাঁ, 'এই সুযোগে একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক।'

নিকল আর আর্দাঁ ডিভানে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। বার্বিকেন জানালা দিয়ে চেয়ে রইলেন বাইরে। দারুণ উত্তেজনায় চোখের ঘুম উবে গেছে তাঁর।

রাত একটা বাজতে তখনও মিনিট পাঁচেক বাকি। নিকল আর আর্দাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন বার্বিকেন।

ঘুম ভাঙতেই ডিভান ছেড়ে এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন আর্দাঁ। ছুটে গিয়ে হাউইয়ের বাক্সটা বের করে আনলেন। ওদিকে নিকলও হাতে একটা দিয়াশলাইয়ের বাক্স নিয়ে তৈরি। বার্বিকেনের ইশারা পেলেই হাউইগুলোর পলতেয় আগুন জ্বেলে ছুঁড়ে দেয়া হবে বাইরে। 'দু'মিনিট পরেই উদাসীন অঞ্চলে ঢুকবে প্রোজেক্টাইল। কাজেই আপনারা তৈরি হোন,' বললেন বার্বিকেন।

'আমরা তো তৈরিই; গোলাটা ভালয় ভালয় এখন উদাসীন অঞ্চলে ঢুকলে হয়,' আর্দাঁ বললেন।

'আর ত্রিশ সেকেন্ড...'

বার্বিকেনের কথা শেষ হতে না হতেই ওঁরা ওজন শূন্যতার খপ্পরে পড়লেন। এক মুহূর্ত দেরি না করে হাউইগুলোর পলতেয় আগুন জ্বাললেন নিকল, আর সেগুলোকে জানালা গলিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলেন আর্দাঁ। হাউইগুলো ঠিকমত বিস্ফোরিত হল কিনা তা ওঁরা দেখতে পেলেন না বটে। কিন্তু প্রোজেক্টাইল যে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়েছে তা বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। বোঝা গেল, গোলাটা কয়েকটা ডিগবাজি দিয়ে আবার কোন একদিক লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছে। কিন্তু সেই দিকটা কোনদিক–এ প্রশ্ন ওদের সবার চোখে-মুখে।

'আমরা কি এবার চাঁদের বুকে নামতে চলেছি?' অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর নীরবতা ভাঙলেন নিকল।

'না। আমরা নামছি ঠিকই তবে চাঁদের বুকে নয়,' বললেন বার্বিকেন।

'তাহলে! কোথায় নামছি আমরা?' বড়বড় চোখ করে জিজ্ঞেস করলেন আর্দাঁ।

'পৃথিবীর বুকে!'

উদাসীন অঞ্চল কিছুক্ষণ আগে পেরিয়ে এসেছে প্রোজেক্টাইল। গোলার ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। বার্বিকেন মনে মনে ভাবলেন–যে গতিবেগে প্রোজেক্টাইল যাত্রা শুরু করেছিল; ফিরতি যাত্রায় গতিবেগ তার চাইতে কম তো হবেই না, বরং পৃথিবীর আকষর্ণের জন্যে কিছুটা বেশি হতে পারে। সুতরাং পৃথিবীর যেখানেই গোলাটা আছড়ে-পড়ুক না কেন, একেবারে ছাতু হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত নিজেদেরকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করার রইল না ওঁদের। তিনজনই একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ঈশ্বরের নাম জপ করতে লাগলেন।

চব্বিশ

জাহাজের নাম এস. এস. সাসকুয়েহানা।

আমেরিকা থেকে হাওয়াই দ্বীপ পর্যন্ত টেলিগ্রাম কেব্‌ল বসানর বিরাট এক সরকারী পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। সেই পরিকল্পনারই অংশ হিসেবে সাসকুয়েহানা এখন প্রশান্ত মহাসাগরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। উদ্দেশ্য সমুদ্রের বিভিন্ন জায়গায় গভীরতা মেপে দেখা।

'কি ব্যাপার, লেফটেন্যান্ট; রিডিং নেয়া এখনও শেষ হচ্ছে না কেন?' হেঁকে উঠলেন ক্যাপ্টেন ব্লুমসবেরী।

'স্যার, সমুদ্র এখানে বড্ডো গভীর', বললেন লেফটেন্যান্ট ব্রন্সফিল্ড। 'তার ওপর রয়েছে বিভিন্ন উঁচু নিচু উপত্যকা আর সামুদ্রিক গুল্ম। এমন জায়গায় পানির রিডিং নেয়াও এক দারুণ সমস্যার ব্যাপার।'

'যাই হোক; দড়ি এ পর্যন্ত কতটুকু গভীরে পৌঁচেছে?'

'সাড়ে তিন হাজার ফ্যাদম; দড়ির সীসা এখনও তলায় ঠেকেনি।'

এমন সময় একজন সহকারী এসে জানাল, রিডিং নেয়া শেষ।

'কত ফ্যাদম?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'তিন হাজার ছ'শো ত্রিশ ফ্যাদম, স্যার।'

'বেশ। তোমরা তাহলে দড়ি উঠিয়ে নিয়েই সামনের দিকে রওনা হয়ে যাও,' বলে নিজের কেবিনে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন।

দড়ি উঠানর কাজ শুরু হল রাত দশটায়। অন্যান্যরা ভেবেছিল, ঝামেলাটা কাল সকালেই সেরে ফেলবে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের কড়া হুকুম–দড়িটা রাতের মধ্যেই উঠিয়ে নিয়ে সামনের দিকে যাত্রা শুরু করতে হবে।

পরিষ্কার আকাশ। চাঁদের আলোও রয়েছে। লেফটেন্যান্টের তদারকিতে কর্মচারীরা দড়ি তোলার কাজে ব্যস্ত। এর ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের মধ্যে খোশগল্প যে হচ্ছে না, এমন নয়। কথায় কথায় চাঁদের প্রসঙ্গ উঠল। একজন কর্মচারী বলল, 'আজ এগারো তারিখ। প্রোজেক্টাইল অ্যাদ্দিনে নিশ্চয়ই চাঁদে পৌঁছে গেছে।'

'পৌঁছেই পৃথিবীতে একটা খবর পাঠানো উচিত ছিল ওঁদের,' মন্তব্য করল আরেকজন।

হাসির রোল উঠল এই কথায়। অন্য আরেকজন বলল, 'চাঁদে বসে চিঠি লেখা কিন্তু ভীষণ মজার ব্যাপার। মি. বার্বিকেনের উচিত ছিল, পৌঁছেই একটা চিঠি লেখা।'

'আড়াই লক্ষ মাইল দূর থেকে চিঠি লিখলই বা–কিন্তু তা বয়ে আনার জন্যে পিওন কোথায়?'

'এ চিঠি বয়ে আনতে ডাক পিওনের প্রয়োজন পড়ে না; চিঠি আপনাআপনি প্রাপকের হাতে এসে পড়ে।'

'বলে কি!'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। মঁশিয়ে আর্দাঁ বলেছিলেন, চাঁদে গিয়ে বড় বড় পাথর কেটে প্রকাণ্ড একেকটা অক্ষর বানিয়ে চাঁদের বুকে সাজিয়ে দেবেন। আর পৃথিবীর লোকজন দূরবীন চোখে দিয়ে তা পড়ে নেবে। ডাক ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটে যাবে, যদি সত্যি সত্যিই এরকমটা করা যায়।'

একথা শুনে একেকজন উল্লাসে ফেটে পড়ল। খোদ লেফটেন্যান্ট পর্যন্ত মানতে বাধ্য হলেন, মঁশিয়ে আর্দাঁর আইডিয়াটা এক কথায় দারুণ!

কথায় কথায় রাত অনেক হল। ওদিকে দড়ি তোলার কাজ শেষ হতে আর সামান্য বাকি। লেফটেন্যান্ট ঘড়ি দেখলেন–একটা বেজে সতেরো। ঘুমে দু'চোখ বুজে আসছে তাঁর। আর দেরি না করে কেবিনের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। ঠিক তখনি একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

লেফটেন্যান্ট যেই মাত্র কেবিনের দরজা খোলার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন, অমনি দূর থেকে একটা শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে আসতে লাগল। আবার ফিরে এলেন তিনি ডেকে। শব্দটা আকাশ থেকেই আসছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শব্দের তীব্রতা বেড়ে গিয়ে মেঘের গর্জনের মত শোনাতে লাগল। আরও কয়েক মুহূর্ত পরে লেফটেন্যান্ট ও তার সহকারীরা যা দেখতে পেলেন, তাতে সবারই আক্কেল গুড়ুম!

আকাশের বুক চিরে একটা অগ্নিকুণ্ড ছুটে আসছে। জিনিসটা ছোটখাট একটা উল্কার মতই দেখতে। মনে হচ্ছে, জাহাজটাকেই লক্ষ্য করে যেন তেড়ে আসছে উল্কাটা। কিন্তু কপাল ভাল বলতে হবে ওদের। অগ্নিকুণ্ডটা জাহাজের বেশ খানিকটা দূর দিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক আলোড়ন উঠল সমুদ্রে। ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজের সামনেটা মড়মড়িয়ে উঠল। গলুইয়ের খানিকটা গেল ভেঙে।

ভাগ্যিস বেশ কিছুটা দূরে পড়েছিল অগ্নিকুণ্ডটা; নইলে গোটা জাহাজটাই ছাতু হয়ে যেত।

ঘুম-জড়ানো চোখে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। 'কি ব্যাপার; লেফটেন্যান্ট, এত হৈ-চৈ কিসের?' চোখ কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'প্রোজেক্টাইল এইমাত্র ফিরে এল, স্যার। গোলাটা এখন পানির তলায়।'

'অ্যাঁ? বলছেন কি, আপনি! মি. বার্বিকেন আর অন্যান্যেরা বেঁচে রয়েছেন তো?' চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়েছে ক্যাপ্টেনের।

'গোলাটাকে উদ্ধার করলে তা জানা যাবে। আপনি হুকুম করলে এক্ষুণি একটা সার্চ পার্টি নামিয়ে দিই, স্যার।'

'নিশ্চয়ই। জলদি সার্চ পার্টি নামিয়ে দেখুন, কোন হদিশ পাওয়া যায় কিনা।'

অভিযাত্রীদের খোঁজে সার্চ পার্টির লোকেরা আশপাশটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল। একটানা কয়েক ঘণ্টা চেষ্টা করেও পোজেক্টাইলের কোন চিহ্নই ওরা দেখতে পেল না কেউ। এ জায়গায় সমুদ্রের গভীরতা এমনিতেই বেশি, তাছাড়া গভীরে নামার মত উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও ওদের সঙ্গে নেই। লেফটেন্যান্ট তাই ওদেরকে ফিরে আসতে বললেন।

পরে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা হল, জাহাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সানফ্রান্সিসকোয় ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে কথাটা কর্তৃপক্ষের কানে তুললে তাঁরা নিশ্চয়ই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

কেমন করে যেন খবরটা আগেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। গলুই ভাঙা সাসকুয়েহানাকে এক নজর দেখার জন্যে সানফ্রান্সিসকো বন্দর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। জাহাজ নোঙর করতেই লোকজনের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন ব্লুমসবেরী। সঙ্গে লেফটেন্যান্ট ব্রন্সফিল্ড। ওঁরা দু'জন ছুটলেন টেলিগ্রাম অফিসের দিকে। সরকারী নৌদপ্তরের সেক্রেটারি, কেমব্রিজ মানমন্দিরের সহ পরিচালক এবং গান ক্লাবের সেক্রেটারির কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হল।

টেলিগ্রামটা মোটামুটি এরকম: 'এগারোই ডিসেম্বর রাত একটা সতেরো মিনিটে প্রশান্ত মহাসাগরে ২০°৭ উত্তর ও ৪১° ৩৭ পশ্চিমে প্রোজেক্টাইল নেমেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।'

রকি পাহাড়ের চূড়ায় দূরবীন চোখে বসেছিল ম্যাস্টন। টেলিগ্রাম পেয়ে এমন এক লাফ দিয়ে উঠল যে, আর একটু হলেই চুড়ো থেকে সটান মাটিতে আছড়ে পড়ত সে।

কেমব্রিজ মানমন্দিরের জাঁদরেল বিজ্ঞানীদের মধ্যেও তুমুল কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। কেউ কেউ বলল, 'ধ্যাৎ, একদম বাজে কথা। ভাল করে খোঁজ নিলে দেখা যাবে ওটা উল্কা ছাড়া আর কিছু নয়।'

অন্যেরা বলল, 'ওটা প্রোজেক্টাইল হতেই বা দোষ কি? কারণ গোলাটা তো বায়ুমণ্ডল পেরুনর সময় উল্কার মতই জ্বলতে থাকবে। সুতরাং আমাদের উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জিনিসটাকে খুঁজে বের করা।'

আমেরিকার নৌ বিভাগও বসে রইল না। ম্যাস্টনের কাছে টেলিগ্রাম এল, এ ব্যাপারে গান ক্লাবকে তারা সাধ্যমত সাহায্য করবে।

ম্যাস্টনের খবরদারিতে উদ্ধার কাজের আয়োজন পুরোদমে চলতে লাগল। ইঞ্জিনিয়ার মার্চিসনকে পাঠানো হল সানফ্রান্সিসকোর একটা কারখানায়। সেখানে গিয়ে তিনি ইস্পাতের প্রকাণ্ড একটা আঁকশি তৈরির অর্ডার দিলেন। আঁকশিটা অটোমেটিক যন্ত্রে খোলা এবং বন্ধ করা যাবে। এখন গোলাটাকে খুঁজে বের করতে পারলেই হল—অটোমেটিক আঁকশি সেটার টুঁটি চেপে ধরে তুলে আনবে ওপরে।

ডুবুরির পোশাকও কেনা হল বেশ কয়েক জোড়া। এ-ছাড়া একটা ডাইভিং বেলও জোগাড় করা হল। জিনিসটা একটা লম্বা খুপরির মত। এর ভেতরে চেপে সমুদ্রের গভীরে যাতায়াত অনেক সহজ এবং নিরাপদ। প্রয়োজনে পানি ঢুকিয়ে কিংবা বের করে দিয়ে ডাইভিং বেলকে ভারি কিংবা হালকা করা যায়। এর ভেতরে করে অক্সিজেন নেয়ারও সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে।

একুশে ডিসেম্বর ম্যাস্টন তার দলবল নিয়ে রওনা হল।

এদিকে গোটা পৃথিবীটাই যেন অভিযাত্রীদের খবর জানার জন্যে হাঁ করে রয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে, লোকজনের উৎকণ্ঠা আর পত্র-পত্রিকায় রকমারি গুজবের খবর দেখতে দেখতে বেড়ে চলেছে।

তেইশ তারিখ সকালে জাহাজ হাজির হল সেই নির্দিষ্ট জায়গায়। বেলা একটার কিছুক্ষণ পরে ডাইভিং-বেলের ভেতরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন ব্লুমসবেরী, মার্চিসন ও ম্যাস্টন। সঙ্গে রয়েছে অক্সিজেনের আধার; এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে পারবেন ওঁরা।.

ডাইভিং-বেলের দরজা বন্ধ করে এবার সেটা নামিয়ে দেয়া হল সমুদ্রে। সমুদ্রের তলায় পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না। বিশেষ ধরনের তৈরি লণ্ঠন দিয়ে ওঁরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। একটানা বারো ঘণ্টা চলল এই খোঁজা-খুঁজির কাজ। কিন্তু প্রোজেক্টাইলের ছায়াও কেউ দেখতে পেল না।

এরপর আরও তিন দিন একইভাবে চলল খোঁজাখুঁজির কাজ। কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। শুধুমাত্র শ্যাওলা-গুল্ম, ডুবো চড়াই-উতরাই আর রকমারি মাছ এবং বিচিত্র সব সামুদ্রিক প্রাণী ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না ওঁদের।

সাতাশ তারিখেও একই ঘটনা ঘটল। সবাই তখন মেনে নিতে বাধ্য হলেন– প্রচণ্ড বেগে সমুদ্রের বুকে আছড়ে পড়ার ফলেই এমনটা হয়েছে। প্রোজেক্টাইল হয়ত একেবারে চুরমার হয়ে সমুদ্রের পানিতে মিশে গিয়েছে।

সবাই এ কথা মেনে নিলেও ম্যাস্টন মানল না। বলল, 'এত বড় গোলাটা ভেঙে চুরমার হলেও তার ছিটেফোঁটা অন্তত খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে কিছুই পাইনি আমরা।'

ম্যাস্টনের কথায় অন্যেরা কান দিল না। উনত্রিশ তারিখে জাহাজ ফিরে চলল সান ফ্রান্সিসকোর দিকে।

জাহাজ মাত্র কয়েক মাইল পেরিয়ে এসেছে; এমন সময় একজন নাবিক দৌড়ে এসে ম্যাস্টনকে বলল, 'স্যার, ওই যে দূরে তাকিয়ে দেখুন। বয়ার মত কি যেন একটা ভাসছে।'

'কই, দেখি?' বলে দূরবীন চোখে দিয়েই চিৎকার করে উঠল ম্যাস্টন, 'প্রোজেক্টাইল! গান ক্লাবের প্রোজেক্টাইল!! সরু দিকটা ভেসে রয়েছে ওপরে, আর তার ওপর পত্ পত্ করে উড়ছে ওটা কি, আমেরিকার পতাকা না? ক্যাপ্টেন, শিগ্‌গির জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে চলুন।'

ম্যাস্টনের চেঁচামেচিতে সবাই ডেকে এসে জড় হয়েছে। ক্যাপ্টেন ব্লুমসবেরী ইতিমধ্যেই জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছেন। জাহাজটা ধীরে ধীরে গোলার দিকে এগুচ্ছে।

পঁচিশ

ম্যাস্টনকে এখন আর পায় কে! উত্তেজনার বশে ডেকের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত কেবলই পায়চারি করে চলেছে। সঙ্গে অবশ্য মার্চিসনও রয়েছেন। আচমকা জিজ্ঞেস করল সে, 'আচ্ছা, বলুন তো, গোলার ওজন কত?'

'প্রায় কুড়ি হাজার পাউন্ড,' জবাব দিলেন মার্চিসন।

'জানেন, আমরা একেকটা নিরেট গাধা। নইলে নিচে না খুঁজে পানির ওপরেই গোলাটাকে খুঁজে বেড়াতাম আমরা।'

'কেন?' ম্যাস্টনের কথায় একটু যেন অবাকই হলেন মার্চিসন।

'কেন আবার! গোলাটার ওজন যাই হোক না কেন, ভেতরটা ফাঁপা। আর্কিমিডিসের সূত্রমত গোলাটা তো পানির উপরেই ভেসে বেড়াবে। এ কথাটা কারও মাথায় যদি আগে ঢুকত, তাহলে এত খাটাখাটনির কোন প্রয়োজন হত না।'

জাহাজ ততক্ষণে গোলার একেবারে কাছাকাছি গিয়ে ঠেকেছে। জাহাজ থেকে কয়েকটা ছোট নৌকো পানিতে নামানো হল। ওই নৌকোগুলো গোলার একেবারে গায়ে গিয়ে ভিড়বে। নৌকোয় চড়তে গিয়ে ম্যাস্টনকে নানারকম আজেবাজে চিন্তায় পেয়ে বসল–বার্বিকেনরা বেঁচে আছেন তো! গোলাটা পানিতে পড়ার পর প্রায় কুড়িদিন কেটে গেল; না কি মরেই ভূত হয়ে গেছেন, কে জানে! বেঁচে থাকার মত অতবেশি অক্সিজেনও হয়ত ওদের মজুদে নেই। সুতরাং···। নাহ্, আর ভাবতে পারছে না সে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে নৌকোগুলো প্রোজেক্টাইলের গায়ে গিয়ে ভিড়ল। কে একজন বাড়ি মেরে একটা জানালা ভেঙে ফেলল। দুরুদুরু বুকে জানালার ফোকর দিয়ে ভেতরে চাইল ম্যাস্টন। যা দেখল, তাতে চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল তার; তিনজনে মিলে ডোমিনো খেলছেন ওঁরা। খুশির চোটে বাচ্চা ছেলের মত এমন এক লাফ দিয়ে উঠল যে, অন্যেরা ধরে না ফেললে পড়েই যেত সে সমুদ্রের পানিতে।

ম্যাস্টন চেঁচিয়ে উঠল, 'মঁশিয়ে আর্দাঁ, আপনারা ভাল আছেন তো?'

বাইরের হাঁকডাক ওঁরা আগেই শুনতে পেয়েছিলেন। বাইরে থেকে জানালাটা ভেঙে ফেলতেই ওঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, কোন উদ্ধারকারী দলের নজরে পড়েছে প্রোজেক্টাইল। কিন্তু ম্যাস্টনকে ওঁদের কেউই এখানে আশা করেনি।

আর্দাঁও চেঁচিয়ে জবাব দিলেন, 'আমরা তো আগোগোড়াই ভাল ছিলাম; কিন্তু আপনাদের কথা ভেবে মাঝেমধ্যে বড়ই দুশ্চিন্তা হত আমাদের, বলুন, এ ক'দিন পৃথিবীতে কাটাতে গিয়ে কোন অসুবিধা হয়নি তো আপনাদের?'

আর্দাঁর কথা শুনে বাকিদের মধ্যে হাসির রোল উঠল। ম্যাস্টন এবার বার্বিকেনকে জিজ্ঞেস করল, 'চাঁদটা ঘুরে আসতে গিয়ে আপনারা কি একটুও ভয় পাননি?'

'ভয়?' অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন বার্বিকেন, 'যখন কেউ উল্কার হাত থেকে মরতে মরতে বেঁচে যায় অথবা চিরকালের জন্যে চাঁদের উপগ্রহ হতে গিয়েও অল্পের জন্যে রেহাই পেয়ে যায়; কিংবা পাঁচ লক্ষ মাইল মহাশূন্য পাড়ি দেয়ার পরেও যদি সাগরের অজানা রাজ্যে তাকে মাইলের পর মাইল চক্কর দিয়ে বেড়াতে হয়, তাহলে সে ভয় পেতেও ভুলে যায়।'

বৈদ্যুতিক সুইচ টিপে দিতেই গোলার দরজাটা খুলে গেল। একে একে ওঁরা তিনজন বেরিয়ে এলেন। পেছনে পেছনে কুকুর নেপচুন। নৌকোগুলো এবার ফিরে চলল জাহাজের দিকে।

রাতারাতি খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে গেলেন অভিযাত্রীরা। ওঁরা ফিরে আসার পরপরই

চাঁদ সম্বন্ধে বহু বছর ধরে চলে আসা অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান হল।

'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' বার্বিকেনের ডায়েরী চড়া দামে কিনে নিয়ে 'চাঁদে অভিযান' শিরোণামে প্রতিদিনই একটু একটু করে ছাপাতে লাগল। ক'দিনের মধ্যেই কাগজের কাটতি পঞ্চাশ লক্ষ কপি ছাড়িয়ে গেল।

গান-ক্লাব অভিযাত্রীদের সম্মানে এক অদ্ভুত ভোজ সভার আয়োজন করল। এতে শুধু ওঁরাই নন, নিমন্ত্রণ পেল গোটা আমেরিকার জনসাধারণ।

এত লোকের খাবার দাবারের আয়োজন করা চাট্টিখানি কথা নয়। বিরাট জায়গার দরকার। তাই সারা দেশের সমস্ত রেলওয়ে প্লাটফর্ম জুড়ে শুরু হল ভোজসভার আয়োজন। সাধারণ লোকদের সুবিধার জন্যে ভোজসভার সময়সূচী পত্রিকা মারফত আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

নির্দিষ্ট দিনে ইলেকট্রিক ঘড়ির সময় অনুসারে ভোজসভা শুরু হল। ওইদিন আমেরিকার সমস্ত লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকল। কেবল একটা ট্রেনকে জাতীয় পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছে। চাঁদ বিজয়ের বার্তা নিয়ে একটানা সেটা ছুটে চলল উত্তর থেকে দক্ষিণে।

কিন্তু এখানেই কি এর শেষ, নাকি শুরু? এ অভিযানের সূত্র ধরে আগামীতে কেউ যদি বার্বিকেনদের উত্তরসুরি হয় তাহলে কি খুব বেশি অবাক হবে কেউ? পৃথিবীর লোকজনের কাছে চাঁদে যাতায়াত একদিন কি খুবই সহজ হয়ে দাঁড়াবে না?

আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ওপর রইল এ সবের উত্তর দেয়ার ভার।

[কাহিনীতে এমন কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব স্থান পেয়েছে যার কোন কোনটা বর্তমান যুগে ত্রুটিপূর্ণ কিংবা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।]

-অনুবাদক

* * *